প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
৮ম সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৯ই চৈত্র
১৩৪০

কলালাপ

কবিবর যতীন্দ্রমোহন একখানি নব-প্রকাশিত বই উপহার দিয়েছেন—"প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি"—অর্থাৎ স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেনের গদ্য-রচনা। ডবল ক্রাউন ৩২৫ পৃষ্ঠা। মোটা কাগজ, ভালো বাঁধাই, সচিত্র।

•

বাংলার আধুনিক পাঠকরা বোধ হয় প্রিয়নাথ সেনের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। প্রিয়নাথের অসাধারণ সাহিত্য-জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা অভিভূত ও উপকৃত হয়েছিলেন যে-সব সাহিত্য-সাধক, তাঁদেরও অধিকাংশই আজ পরলোকে; এবং তাঁর সব-চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু রবীন্দ্রনাথ, যিনি অনায়াসেই একখানি সুবৃহৎ ও সুন্দর লেখনী-চিত্র এঁকে বাংলা সাহিত্যের এই অতুলনীয় রসিকের মূর্ত্তিকে চির-স্মরণীয় করে রাখতে পারতেন, তিনিও তাঁর জন্যে নিজের "জীবন-স্মৃতি"তে কয়েকটি পংক্তি ছাড়া আর-কিছুই রচনা করতে পারেন নি। প্রিয়নাথ মাঝে মাঝে কলম হাতে নিয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে গদ্যে-পদ্যে ছোট ছোট ফুল ফোটাতেন বটে, কিন্তু সেগুলি অতীতের বিভিন্ন মাসিক-পত্রের পৃষ্ঠার ভিতরেই এতদিন বন্দী হয়ে ছিল। কাজেই আধুনিক পাঠকদেরও দোষ দেওয়া যায় না—প্রিয়নাথকে জানবার সুযোগ তাঁরা পান নি।

•

প্রিয়নাথ সেনের সুযোগ্য পুত্র তাঁর স্বর্গীয় পিতার বিক্ষিপ্ত গদ্য-রচনাগুলি একত্র ক'রে এতদিন পরে প্রকাশ করেছেন ব'লে আনন্দিত হয়েছি। যদিও মাত্র এই কয়েকটি রচনাই প্রিয়নাথকে বোঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়, তবু একেবারে কিছুই না থাকার চেয়ে সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর সামান্য কোন স্মৃতিচিহ্ন স্থায়ী করবার চেষ্টারও মূল্য আছে। ভবিষ্যতের

চাঁদ সদাগর—চিত্রে
নেতা—শ্রীমতী নীহারবালা

বাঙালী পাঠক রবীন্দ্রনাথের "জীবনস্মৃতি"তে যখন এই কথাগুলি পড়বে—"এই 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত' রচনার দ্বারা আমি এমন একজন বন্ধু পাইয়াছিলাম, যাঁহার উৎসাহ অনুকূল আলোকের মত আমাকে কাব্য-রচনার বিকাশ চেষ্টায় প্রাণসঞ্চার করিয়া দিয়াছিল। তিনি শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন। ... ... সাহিত্যের সাত সমুদ্রের নাবিক তিনি। দেশী ও বিদেশী প্রায় সকল ভাষার সকল সাহিত্যের বড় রাস্তায় ও গলিতে তাঁহার সদাসর্ব্বদা আনাগোনা। তাঁহার কাছে বসিলে ভাবরাজ্যের অনেক দূরদিগন্তের দৃশ্য একেবারে দেখিতে পাওয়া যায়। সেটা আমার পক্ষে ভারি কাজে লাগিয়াছিল। সাহিত্য সম্বন্ধে পূরা সাহসের সঙ্গে তিনি আলোচনা করিতে পারিতেন—তাঁহার ভাললাগা মন্দলাগা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত রুচির কথা নহে। একদিকে বিশ্ব-সাহিত্যের রস-ভাণ্ডারে প্রবেশ ও অন্যদিকে শক্তির প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস—এই দুই বিষয়েই তাঁহার বন্ধুত্ব আমার যৌবনের আরম্ভকালেই যে কত উপকার করিয়াছে, বলিয়া শেষ করা যায় না। তখনকার দিনে যত কবিতাই লিখিয়াছি, সমস্তই তাঁহাকে শুনাইয়াছি এবং তাঁহার আনন্দের দ্বারাই আমার কবিতাগুলির অভিষেক হইয়াছে। এই সুযোগটি যদি না পাইতাম তবে সেই প্রথম বয়সের চাষ আবাদে বর্ষা নামিত না এবং তাহার পরে কাব্যের ফসলে ফলন কতটা হইত বলা শক্ত"—তখন তাদের বিস্মিত ও কৌতূহলী দৃষ্টি প্রিয়নাথকে খুঁজলে, এই রচনা সংগ্রহের ভিতর থেকে হয়তো তাঁর কোন কোন বিশেষত্ব আবিষ্কার করতে পারবে।

*

কেবল বাঙালী পাঠক নন, এখানকার আধুনিক সাহিত্যসেবকরা পর্য্যন্ত নিকট-অতীতকে নিয়েও বড় বেশী মাথা ঘামান ব'লে মনে হয় না। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত ও ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, এই সেদিনকার টেকচাঁদ, হুতোম-প্যাঁচা, বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্র সেন ও অক্ষয়কুমার প্রভৃতির রচনার সঙ্গে সুপরিচিত হবার উদ্দীপ্ত আগ্রহ আজকালকার ক-জন সাহিত্য-সেবকের আছে? দুর্ভাগ্যের কথা বলব কি, "প্রবাসী"র মত প্রধান মাসিক-পত্রেও এখন যে-ব্যক্তি বাংলার পাঠযোগ্য একশোখানা কেতাবের তালিকা দেবার স্পর্দ্ধা রাখেন, নগণ্য পুস্তকের পর পুস্তকের নাম তালিকাভুক্ত ক'রেও তিনি অতীতের চিরস্মরণীয় সাহিত্যসাধকদের সাধনার নিধির কথা ভুলে যেতে লজ্জিত নন! এই-সব দেখে-শুনে জানতে সাধ হয়, বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের গতি কোন্ রসাতলের দিকে? পৃথিবীর সব বড় সাহিত্যেই দেখি, অতীতকে চির-উজ্জ্বল ক'রে রাখবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা। এমনি চেষ্টার ফলে ইংরেজী সাহিত্যে এমন অনেক কবি ও লেখকের নাম স্বর্ণাক্ষরে জাগ্রৎ হয়ে আছে, যাঁদের দান এতখানি বড় ক'রে না দেখলেও হয়তো খুব-বেশী অন্যায় হ'ত না। কিন্তু তবু যে তাঁদের স্মৃতিকেও বিসর্জ্জন দেওয়া হয়নি তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, ওদেশের লোক এটা জানে ও মানে যে, অতীতেরপ্রতি শ্রদ্ধা কেবল জাতীয় গৌরবই বাড়ায় না, বর্ত্তমানের যে-শক্তি ঘুমন্ত তাকেও জাগ্রৎ করে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্য কেবল রাশি রাশি অপাঠ্য উপন্যাস, গল্প, কবিতা এবং যা-ইচ্ছা-তাই প্রলাপ প্রসব করছে, সাহিত্য ও আর্টের আলোচনা স্থায়ী-সমালোচনা ও উল্লেখ্য জীবনী-সাহিত্য সৃষ্টির অবসর তার মোটেই নেই। এর প্রধান হেতু হচ্ছে, অতীতে এই-সব ক্ষেত্রে যে-সকল প্রতিভাধর আপনাদের জীবনী-শক্তি নিঃশেষে ব্যয় ক'রে গেছেন, আমরা ভুলেও আর তাঁদের কথা ভাবি না। তাঁদের প্রতি এই অপরিসীম অবজ্ঞা বর্ত্তমানে আর কারুকেই ঐ-সব ক্ষেত্রে যাবার জন্যে উৎসাহের খোরাক যোগায় না। এমন দেশে আজ প্রিয়নাথ সেনের মত যশোলিপ্সায় উদাসীন রসিককে মনে রাখতে চাইবে কে?

*

ডাক্তার স্যামুয়েল জনসন ইংরেজী সাহিত্যে একজন অমর ব্যক্তি এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সকলে তাঁর মৃত্যুর দেড়শো বছর পরেও তাঁর কথা নিয়ে আজও আলোচনা করে। তাঁর বিখ্যাত অভিধান আজ অপ্রচলিত এবং তাঁর লেখা "Vanity of Human Wishes, "Rasselas," "The Idler" ও "Lives of the Poets" প্রভৃতি বইগুলি যে একেলে পড়ুয়াদের খুব অভিভূত করে, এমন মনে করবার কারণ দেখি না। কিন্তু তবু আজও তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন বস্‌ওয়েল সাহেব। একসময়ে জনসনের যে-সব মতামত ও বচন এবং ব্যক্তিত্ব ইংরেজী সাহিত্যের উপরে মন্ত্রশক্তির মতন প্রভাব বিস্তার করেছিল, বস্‌ওয়েলের জীবনীর জন্যে আজও তার প্রভাব ক্ষীণ হয় নি। তাঁর নশ্বর দেহই নষ্ট হয়েছে, কিন্তু তাঁর অমূল্য বাণী, বিচার-শক্তি ও বৈদগ্ধ আজও তেমনি জীবন্ত হয়ে জেগে আছে। বাংলা দেশেও এতদিন কেউ চেষ্টা করলে প্রিয়নাথ সেন ও তৎকালীন বঙ্গসাহিত্য-সমাজ সম্বন্ধে একখানি চিরস্মরণীয় পুস্তক লেখা যেতে পারত। যাঁর সাহিত্য জ্ঞান রবীন্দ্রপ্রতিভাবিকাশেও সাহায্য করেছিল, সাহিত্যকুঞ্জে কলগুঞ্জন করাই ছিল যাঁর জীবনের চরম আনন্দ, গতযুগের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককেই যাঁর রসের বাগান রস যোগান দিত, সেই মানুষটির একখানি সম্পূর্ণ জীবনী-চিত্র রাখবার ব্যবস্থা হ'লে বাংলা-দেশের সকল যুগের সকল সাহিত্যিকই উপকৃত ও ধন্য হ'তে পারতেন। এখনো কোন কোন সাহিত্যিক চেষ্টা করলে হয়তো এ অভাব থাকে না, কিন্তু এ আশা আজ দুরাশা, কারণ তাঁরা আজ এত ব্যস্ত ও মত্ত যে, এ-সমস্ত কাজে তাঁদের মন বসতে পারে না। "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"র পরিশিষ্টে প্রকাশিত পত্রাবলীতে দেখছি, অপরের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিন প্রিয়নাথের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে লিখেছিলেন, "এ সম্বন্ধে যদি তোমার কোন বন্ধুকৃত্য করিবার থাকে ত করিবে।" আজ দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হ'চ্ছে যে, প্রিয়নাথ সম্বন্ধেও তাঁর অনেক বন্ধুর অনেক-কিছুই কর্ত্তব্য ছিল, কিন্তু অদ্যাবধি সে কর্ত্তব্য পালন করা হয় নি।

*

আমরা যখন সাহিত্যক্ষেত্রে সবে প্রবেশ করেছি, সেই সময়ে বার-দুয়েক প্রিয়নাথের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য ও সুযোগ পেয়েছিলুম। তার আগেই "সাহিত্য", "ভারতী" ও "প্রদীপ" প্রভৃতি পত্রে প্রকাশিত তাঁর একাধিক কবিতা ও প্রবন্ধ প'ড়ে আমরা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলুম। লেখা প'ড়ে অনেক সাহিত্যিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে জীবনে অনেক বারই হতাশ হ'তে হয়েছে। তাঁদের চরিত্র ও রচনা কতটা পরস্পরবিরোধী! যদিও প্রিয়নাথকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনবার ভাগ্য আমাদের হয় নি, তবু অসংখ্য পুস্তকের 'জনতা'র মাঝখানে সমাহিত প্রিয়নাথকে দুদিন দেখেই চিনতে বিলম্ব হয় নি যে, বিবিধ রচনার ভিতর থেকে এর আগেই কল্পনায় আমরা যাঁকে আবিষ্কার করেছিলুম, ইনি হচ্ছেন তিনিই!

*

প্রকাশ্যে লেখনী ধারণ করতে প্রিয়নাথ বরাবরই নারাজ ছিলেন, তাই ইচ্ছা করলেই যিনি বাংলা সাহিত্যকে বিশেষরূপে সমৃদ্ধ করতে পারতেন, তিনি তাকে রীতিমত ফাঁকি দিয়ে গেছেন। কিন্তু যখনি সত্যিকার কোন ভালো জিনিষ তিনি আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছেন, তখনি প্রাণের আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে কলম না ধ'রে

থাকতে পারেন নি। তাঁর অধিকাংশ গদ্য রচনাই এই আনন্দের বিমল প্রকাশ। এই সব প্রবন্ধে তাঁর সূক্ষ্ম-সমালোচন-শক্তির সুন্দর বিকাশ আছে। তিনিই হচ্ছেন আসল সমালোচক, যিনি অসির ধর্ম্মকে মসীর ধর্ম্ম ক'রে তোলেন না, মন যাঁর সহানুভূতি ও স্নেহ-মমতায় ভরা, উপভোগের আনন্দে যাঁর আত্মপ্রকাশ এবং সুন্দরের যিনি পুরোহিত। প্রকৃত সমালোচকের এই সমস্ত গুণই প্রিয়নাথ সেনের রচনায় পাওয়া যায়। সাহিত্যকে বিষাক্ত দংশনে জর্জ্জরিত ক'রে যাঁরা সমালোচক নাম ক্রয় করেছেন, প্রিয়নাথ কোনদিনই তাঁদের দলে ছিলেন না। আজ সেইদিনের কথা মনে পড়ছে, যেদিন "সাহিত্য" পত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল "কাব্যে নীতি" লিখে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে হঠাৎ এক অদ্ভুত যুদ্ধঘোষণা করেছিলেন। সেদিনকার বিষম সাহিত্যিক আন্দোলন কোনদিনই ভুলতে পারব না। বাংলা সাহিত্যে আচম্বিতে দুটি দলের সৃষ্টি হ'ল এবং দুই দলই সাময়িক উত্তেজনায় অধীর হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে যে-সব বাক্য-প্রয়োগ করতে লাগলেন, সেগুলিকে কোনক্রমেই শিষ্ট ও ভদ্র ব'লে ভ্রম করবার যো ছিল না। প্রিয়নাথ রবীন্দ্রনাথের এমন বন্ধু ও ভক্ত ছিলেন যে, দ্বিজেন্দ্রলালের তীব্র ও তিক্ত ভাষা শুনে তাঁর লেখনীও কটু হয়ে উঠলে আমরা কেহই অবাক হতুম না। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের মতের প্রতিবাদ ক'রে "চিত্রাঙ্গদা" নামে তিনি যে দীর্ঘ রচনাটি প্রকাশ করলেন, সংযমে, ভদ্রতায় ও সাহিত্য-বিচারে তা চমৎকার এবং তার মধ্যে সাময়িক উত্তাপ বা উত্তেজনাও নেই। প্রিয়নাথের সমস্ত সমালোচনার মধ্যেই এটা একটা লক্ষ্য করবার বিষয় এবং তাঁর সমস্ত সমালোচনাই আদর্শ সমালোচনা রূপে স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাবার যোগ্য। ভালো সমালোচক একসঙ্গে সমালোচক ও স্রষ্টা। প্রিয়নাথ ছিলেন তাই, তাঁর আলোচনায় সমালোচ্য পুস্তকের প্রকৃতি ও পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেই সঙ্গেই নব নব সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য ও সংগ্রহ করা চলে। বিলাতের সমালোচক রাস্কিনের ললিত-কলা ও রচনা-শিল্প নিয়ে প্রিয়নাথ যে প্রবন্ধটি লিখেছেন, সেইটিই হচ্ছে তাঁর সাহিত্য-জীবনের সব-চেয়ে বড় ও সেরা লেখা। এমন সুন্দর রচনা বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। এই লেখাটি যখন "প্রদীপ" পত্রে বেরিয়েছিল, সে আর এক যুগের কথা। এখনকার অধিকাংশ বিখ্যাত লেখকই তখন সাহিত্যক্ষেত্রে ভূমিষ্ঠ হন নি, কিন্তু সাহিত্যের ভঙ্গি, যুগ ও আদর্শের বহু পরিবর্ত্তনের পরে আজকের দিনেও প্রিয়নাথের "রস্কিনে"র মূল্য একটুও কমেনি, এখনকার যে কোন সাহিত্যিক তাঁর ঐ লেখাটি পড়লে উপকৃত হবেন। তার কারণ "কাব্য-কথা" প্রবন্ধে প্রিয়নাথ নিজেই বলেছেন—"রসের মধ্যে একটা নিত্যতা আছে। মান্ধাতার আমলে মানুষ যে রসটি ভোগ করিয়াছে, আজও তাহা বাতিল হয় নাই।" এখানকার অধিকাংশ সাহিত্যিক এই পরম সত্যের সঙ্গে পরিচিত নন ব'লেই অতীতের প্রতি হেনস্থা প্রকাশ ক'রে নিজেরাই পদে পদে ঠ'কে যাচ্ছেন। অতীতের যে সব কলাবিদের সঙ্গে ঐ নিত্য রসবস্তুটির সম্পর্ক আছে, পুরাণো সেকেলে মানুষ ব'লে কোনদিনই তাঁদের বাতিলের দলে ঠেলে রাখা চলে না।

*

আগেই বলা হয়েছে, ইচ্ছা করলে প্রিয়নাথ অনেক-কিছুই হ'তে পারতেন, কিন্তু ইচ্ছা না ক'রে আমাদের তিনি ফাঁকি দিয়ে গেছেন। এমন তাঁর বিচার-ক্ষমতা ছিল যে, তাঁর মনের মত হয়-নি ব'লে রবীন্দ্রনাথও তাঁর কোন কাব্য-পুঁথি আর দ্বিতীয়বার প্রকাশ করেন নি। বহুভাষাবিদ পণ্ডিত রূপেও তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন, কিন্তু নানা ভাষায় এই গভীর জ্ঞানকে তিনি কেবল নিজের গোপন আনন্দের জন্যে ব্যবহার ক'রে গেছেন, দেশের ও দশের সেবায় তা প্রয়োগ ক'রে নাম কিনতে চান নি। দু চারটি ইংরেজী কবিতাও তিনি লিখে গেছেন, নিজের মনের খেয়ালে। কিন্তু কলাবিদের এই খেয়ালের মধ্যেও যে তুচ্ছতা ছিল না কিছুমাত্র, বিখ্যাত ইংরাজ সমালোচক এডমণ্ড গসের একখানি পত্র তার প্রমাণ দিচ্ছে। প্রিয়নাথকে তিনি লিখছেন "... ... ... Your verses remind me of the English poetry of Goethe, which had similar peculiarities. I am sure you will not mind being compared with so eminant a man." এই সব কথা মনে ক'রে দুঃখ হয়—হায়, প্রিয়নাথ জীবনে কেন এমন কোন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হ'তে পারলেন না, যাঁর প্রবল প্রেরণা আলস্যের আনন্দের ভিতর থেকে তাঁকে টেনে বার ক'রে আনতে পারত! Anatole France এম্নি এক সুহৃদের সন্ধান পেয়েছিলেন, প্রিয়নাথ কেন পেলেন না?

•

এবারে এই সঙ্গে দুটো অবান্তর কথাও ব'লে নি, কারণ এই "প্রিয়পুষ্পাঞ্জলি"খানির পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আগেকার অনেক স্মৃতিই মনে পড়ছে। বছর বিশ-পঁচিশ আগে সাহিত্যক্ষেত্রে সাহিত্যকদের ভিড় এতটা পুরু ছিল না এবং তাঁদের কোলাহলও ছিল না এতটা গগনভেদী। কাজের মানুষরা কাজ ফেলে কোলাহল করবার সময় পান কম এবং আমাদের বিশ্বাস, এখনকার চেয়ে তখনকার সাহিত্যিকরা কাজের মতন কাজ করতে পারতেন বেশী। এখন ঔপন্যাসিক, গল্প-লেখক ও কবির দলে লোক বেড়েছে বটে, কিন্তু তরুণ সন্দর্ভকার, সাহিত্য-সমালোচক ও ঐতিহাসিক কোথায়? মাসিকপত্রে তুচ্ছ অনুবাদকের সংখ্যা অল্প দেখি না, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মতন উচ্চশ্রেণীর সাধকের দেখা নেই। আজও যাঁরা বাংলা দেশে কবিত্বে শ্রেষ্ঠ ব'লে বিখ্যাত, তাঁরা প্রায় সকলেই গতযুগে কাব্য-সাধনা সুরু করেছেন। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়ের মতন কবিও এখন চারিদিকে সুখ্যাতি কুড়োচ্ছেন, কিন্তু বারো-চোদ্দ বছর আগেও তাঁর মতন পদ্য-লিখিয়েরা মোটে কল্কে পেতেন না। উপন্যাস-মহলেও দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র প্রথম জীবনেই শক্তির যে অভিব্যক্তি দেখিয়েছিলেন, আধুনিক কোন ঔপন্যাসিকেরই মধ্যে তা নেই। নাট্য-সাহিত্যও আগেকার তুলনায় এখন কতখানি দরিদ্র! তবু এত কোলাহল!

•

সে-যুগের সাহিত্যিকরা সাহিত্য-সাধনায় নিযুক্ত হয়ে এত-বেশী টাকা টাকা করতেন না। মাসিকপত্রের অধিকাংশ লেখকই এক পয়সা পাবার আশা রাখতেন না। তাঁরা জানতেন যে সাহিত্য-সাধনা হচ্ছে আনন্দের সাধনা, তাই টাকা রোজগারের জন্যে ভিন্ন পথ অবলম্বন ক'রে তাঁরা সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ করতেন। অবশ্য এটা ভালো কি মন্দ, তা নিয়ে কোন মতপ্রকাশ না ক'রে কেবল এইটুকুই বলতে চাই যে, সাধারণতঃ সাহিত্যকে তখন অর্থদায়ক ব'লে মনে করা হ'ত না ব'লে, সাহিত্যের মধ্যে পাটোয়ারি-বুদ্ধির উপদ্রবও দেখা যেত অল্প। টাকা-আনা-পয়সা আনতে পারে ব'লে এখন এমন সব লেখকও গল্প ও উপন্যাস রচনা করতে ব্যস্ত হন, ও-বিভাগে যাঁদের প্রবেশাধিকার নেই। আর্টের অন্য এক বিভাগে—চিত্রকলায়—এই পাটোয়ারি-বুদ্ধির প্রভাব দেখে একজন প্রসিদ্ধ বিলাতী লেখক বলছেন, "I should certainly desire to help any artist of talent, but with some knowledge of the game I am bound to admit that commercial considerations are far too

much in evidence, and for one good man who is discovered ten poor painters find themselvss lauded to the skies" ... ... Andre Lhoteও তাই বলেছিলেন, "If paintings did not sell, painting would be saved." ... ... "আধুনিক চিত্রকলার গতি কোন্ দিকে?" এই প্রশ্নের উত্তরেও তিনি বলেছিলেন, "In the direction of the merchants. There is, practically speaking, no other direction. The younger men—and the older men—think chiefly of selling. One season they will cultivate this style and the next another style. They will be romantic or realist or cubist. If they hit upon a successful trick that can be exploited, they will stick to it; but principally their desire is to sell and they will do anything to obtain a contract." অধিকাংশ আধুনিক বাঙালী সাহিত্যিকের উপরেই একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রায় এই উক্তিই প্রয়োগ করা যায়। এমন কি, এ-রকম সাহিত্যিককেও আমরা জানি, জীবিকা-নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় না পেয়েই যিনি সাহিত্যকে অবলম্বন করেছেন। আগে (এবং আজও) যেমন অনেকেই আর সব দিকে গলাধাক্কা খেয়ে হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করত এবং এখন যেমন চায়ের বা মণিহারীর দোকান খুলে বসে।

*

প্রিয়নাথ যে-যুগের লোক, সে-যুগের সাহিত্য-বৈঠকগুলিও প্রত্যেক সাহিত্যিকের পক্ষে উপকারী ও আনন্দদায়ক ছিল। ফ্রান্সের মত এদেশেও সাহিত্যিক ও কলাবিদদের মিলনের জন্যে Salon-এর প্রতিষ্ঠা হয়নি বটে, কিন্তু বাংলাদেশে আগেকার সাময়িক পত্রগুলির কার্য্যালয় এ অভাব কতকটা মোচন করেছিল। আগেকার মানসী-কার্য্যালয়, যমুনা-কার্য্যালয়, সঙ্কল্প-কার্য্যালয়, মর্ম্মবাণী-কার্য্যালয় ও ভারতী-কার্য্যালয়ের কথা স্মরণ করলেই এখন মনে হয়, কী সুখের দিনই আমাদের চ'লে গেছে! বাংলাদেশে সাহিত্যে ও কলায় যাঁরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, ঐ-সব বৈঠকে গিয়ে অতি-নবীনরাও তাঁদের সঙ্গে মেলা-মেশার ও আলাপ-আলোচনার দুর্লভ সুযোগ লাভ করতেন। ও-সব বৈঠকে যে-সব কথাবার্ত্তা হ'ত, এখন আর কোথাও গিয়ে তা শুনতে পাই না। ওর প্রত্যেকটি ছিল আনন্দের ভিতর দিয়ে সাহিত্য-শিক্ষার আরাম-কুঞ্জ। "বিচিত্রা" ও "সাহিত্য-সঙ্গতে"র মতন বৈঠকও এখন আর কোথাও বসে না। ফলে পরস্পরের সাহায্য পেয়ে এখনকার সাহিত্যিকরা আর উপকৃতও হন না এবং তাঁদের মধ্যে প্রীতির ভাবটাও যেন ক্রমেই ক'মে আসছে। এখনো মাঝে মাঝে দু-একটা বৈঠক বসাবার চেষ্টা যে হয় না, তা বলছি না; কিন্তু সেগুলি যেন অনেকটা ছোটখাটো সভা-সমিতির অধিবেশনের মত এবং সে-সব আসরে সকল সাহিত্যিকেরই উপস্থিত হবার অধিকারও নেই। একালকার অধিকাংশ সাময়িক পত্রের কার্য্যালয়ই যেন ব্যবসার স্থান বা সওদাগরি আপিস, সেখানে নিছক আর্টের প্রসঙ্গ তোলা হয় অপরাধের, নয় বেনাবনে মুক্তা ছড়ানোর মত। এখনো দু-এক জায়গায় গেলে হয়তো মাঝে মাঝে আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু সে আনন্দও যেন মরা-গাঙে ভাঁটার টানের মত, কারণ পূর্ব্বকথিত বৈঠকগুলির মতন পরিপূর্ণতা ও গুণীজনের জনতা সেখানে কোনদিনই থাকে না।

*

আনন্দ-পরিষদের নূতন অভিনয়-আয়োজনের সংবাদ পেয়ে সুখী হলুম। এই প্রতিষ্ঠানটি একাধিকবার যে কলানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, আশা করি এবারেও তার অভাব ঘটবে না। এবারে এখানকার সভারা যে নূতন নাটক নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হবেন, তার নাম "রূপেশের স্ত্রী"। বিস্তৃত বিবরণ পরে দেবার চেষ্টা করব।

*

নিজস্ব সংবাদদাতা খবর দিচ্ছেন—

শোনা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয় "মোগল-পাঠান"-প্রণেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একখানি নাটক অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করবেন ব'লে স্থির করেছেন। নাটকখানি নাকি ত্রেতাযুগের রাম-রাবণ-হনুমান এবং লঙ্কাকাণ্ড-সম্পর্কীয় ঘটনার সাহায্যে রচিত হয়েছে। আবার অন্য জনরব শিশিরকুমারের সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের দু'খানি নামকরা উপন্যাসের নাম করছে!

*

'রঙমহলে' আগামী শনিবারে "পতিব্রতা" দর্শন দেবেন। কুমার ধীরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের "স্পর্শের প্রভাব" নামক উপন্যাস থেকে শ্রীযুত যোগেশ চৌধুরী এই "পতিব্রতা"কে আবিষ্কার করেছেন। 'পতিব্রতা' যদি সফল হয় তাহলে হয়তো "মহানিশার" স্থান অধিকার করবে।

*

বীডন উদ্যান একজিবিশনে 'রূপমন্দির' নামে একটি থিয়েটারের আখড়া খোলা হয়েছে। এই রূপ-মন্দিরে কিসের পূজা হয়, সুরূপের কি কুরূপের, তা আমাদের প্রত্যক্ষভাবে জানা নেই বটে কিন্তু লোকমুখে যা শুনছি তাতে মনে হচ্ছে যেন, কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের একজিবিসনে এনন-ধারা একটি বাজে থিয়েটারী দল না বসিয়ে এমন কোন রুচিপূর্ণ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান করলেই ভাল করতেন যেখানে গিয়ে ভদ্র মহিলা এবং পুরুষগণ নিঃসঙ্কোচে আনন্দের খোরাক সংগ্রহ করতে পারতেন।

*

লোক-পরম্পরায় শোনা গেল যে 'নাট্য-নিকেতনে'র পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয়ের কাছেও রাম-রাবণের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সংক্রান্ত এক পালা এসে পড়েছে এবং তিনি সেখানি নিয়ে রীতিমতো ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। ওদিকে মোড়ের মাথায় 'রঙমহলে'ও যোগেশবাবুর "রাবণ" যদি উৎসাহিত হ'য়ে আস্ফালন সুরু ক'রে দ্যান, তাতেও আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুতরাং ব্যাপার যা দাঁড়াচ্ছে তাতে অদূর-ভবিষ্যতে এমন দিন আসা অসম্ভব নয় যেদিন দেখা যাবে যে হাতীবাগান অঞ্চলের তিন তিনটি রঙ্গালয়ে রাম-রাবণের ভয়াবহ যুদ্ধের পালা চলেছে এবং সেই হাঙ্গাম-হুজ্জতের মাঝখানে প'ড়ে দর্শকবৃন্দ অসহায় উলুখড়ের মতো ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

ছাতের ছোট ফুলের টবে,
ডালিয়া-গোলাপ খেল্‌চে হোরী নতুন রঙের মহোৎসবে।

•

আজ্‌কে তোমায় ফুলের রাণী!
ডাক্‌চে বাতাস সুবাস আনি,
অপ্‌রাজিতা লতার পাশে তনু-লতার আসন হবে।

•

শোনো শোনো, প্রজাপতি বাজায় মনে মৌন বেণু,
মৌমাছিরা ঝরিয়ে গেল তোমার গালে রঙের রেণু।

•

আজ্‌কে আমার প্রাণের দেশে
দুটি নয়ন বেড়ায় হেসে,
আঁখির হাসির ভাষায় ফোটে মর্ম্ম-মুকুল সগৌরবে।

চিত্রপুরী: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয়: চাঁদসদাগর (ভারতলক্ষ্মী পিক্‌চার্স)
প্রধান ভূমিকায়—অহীন্দ্র চৌধুরী;
শেফালিকা; ধীরাজ ভট্টাচার্য্য; নীহারবালা প্রভৃতি।
পরিচালক—প্রফুল্ল রায়
ছবিখানি কাল থেকে ক্রাউন সিনেমায় দ্বিতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করবে।

•

"চাঁদসদাগরের" বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত-নামে মন্মথ রায়ের যে নাটক আছে তার থেকে—বস্তুতপক্ষে ছবি চাঁদসদাগর নাটক-চাঁদসদাগরেরই চিত্ররূপ।

এই চিত্ররূপকে সার্থক ক'রে তোলবার জন্তে পরিচালক প্রফুল্লবাবু যে বিরাট আয়োজন করেছেন, তেমনতরো আয়োজনের ঘনঘটা আজ পর্য্যন্ত দেশীয় অন্য কোন ছবিতেই দেখা যায় নি। রাজকীয় ঐশ্বর্য্য এবং আড়ম্বরের সমারোহে "চাঁদসদাগর" সুবিচিত্র হ'য়ে উঠেছে - দর্শকদের নয়ন-মন বিমোহিত করবার জন্তে ছবির কর্ম্মকর্ত্তারা অকাতরে অর্থব্যয় করতে কুণ্ঠিত হন নি; ফলে, ছবিখানির মধ্যে জাঁকজমকের ঘটা আছে বেশীর চেয়ে আরও বেশী! এবং আমাদের বিশ্বাস, বাঙালী দর্শকদের কাছে এই ঐশ্বর্য্য ও আড়ম্বরের শোভাযাত্রা বিশেষ লোভনীয় হবে।

•

কিন্তু যে কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে এত পরিশ্রম, এত অর্থব্যয় সে-কাহিনী আজকের দিনে প্রগতিশীল বাঙালী মনের ওপর কতখানি মায়া বিস্তার করতে সক্ষম হবে, তা বিবেচনা করবার বিষয়। মনসা দেবীর কাহিনী বাঙালীর নিজস্ব হলেও তার মধ্যে বিশেষ এমন কী শাশ্বত রসবস্তু আছে, যা দর্শকচিত্তকে আলোড়িত করবে? ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের অধ্যক্ষগণ বিষয়-নির্ব্বাচনে অধিকতর বিবেচনা-শক্তি ব্যবহার করলে ভালো করতেন।

•

উল্লিখিত শেষ-বাক্যটির দ্বারা আমরা এ বলতে চাইছি না যে, "চাঁদসদাগর" ছবিখানি নিছক মন্দ হয়েছে;—আমরা বলতে চাইছি যে, তাঁদের ওই বিরাট আয়োজন যদি অন্য কোন অধিকতর মনোরম ও রসসমৃদ্ধ কাহিনীকে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত করত, তাহলে সে-ছবি হয়ত দেশীয় চিত্র-জগতে যুগান্তর আনতে সক্ষম হত। মন্মথবাবুর "চাঁদসদাগর" 'মেলো-ড্রামা' হিসাবে মন্দ নাটক নয়, কিন্তু একথা বারবার প্রমাণিত হ'য়ে গেছে যে, ভালো নাটক হ'লেই যে তার দ্বারা ভালো চিত্রনাট্য তৈরী হ'তে পারবে—এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। এই সূত্রে চিত্রপ্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাদের সেই কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই।

•

চাঁদসদাগরের সেটিং-এর তুলনা হয় না। প্রত্যেক দৃশ্যের কারুসজ্জার তুচ্ছতম খুঁটিনাটির প্রতি যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পেয়েছি, তা আমাদের শুধু মুগ্ধ করেনি, বিস্মিত করেছে। চাঁদসদাগরের কারুশিল্পী ও কারুসজ্জা পরিচালক (art director) উচ্চতম প্রশংসার অধিকারী।

ছবির পরিচালনার কাজেও প্রফুল্লবাবু স্থানে স্থানে উচ্চশ্রেণীর রসবোধ ও শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। জনতার দৃশ্য যে তিনি সুচারুরূপে চালনা করতে পারেন, তা আমরা আগে থাকতেই জানতাম। চাঁদসদাগরে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।

*

চাঁদসদাগরের আর একটি মনমুগ্ধকর বিশেষত্ব হচ্ছে এর—Background Music!—সত্যিই চমৎকার! নিতাই মতিলাল এই সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। তাঁকে যথাযোগ্যভাবে প্রশংসা করবার মতো উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে পাচ্ছিনা। তাঁকে বারবার অভিনন্দিত করি।

চাঁদসদাগরের দৃশ্য-বিশেষে যে রোমাঞ্চকর আবহের সৃষ্টি হয়েছিল, তার জন্যে একমাত্র দায়ী তার নেপথ্য-সঙ্গীত! এমনতরো Artistic ও effective সুর-সংযোজনা এর আগে একখানি মাত্র বাংলা ছবিতে শুনেছি।

*

ছবিখানির টেম্পো, আলোকশিল্প এবং শব্দগ্রহণ-এর কাজ আশানুরূপ হ'লে "চাঁদসদাগর" যে বাংলা ছবির জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করত, তাতে আর সন্দেহ নেই। এর অভিনেতৃবর্গের অভিনয় এবং পরিচালনা মোটের ওপর আমাদের অখুসী করে নি।

*

"কালী ফিল্মস্"-এর পরিচালক প্রিয়বাবু শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর "অন্নপূর্ণার মন্দির" নামক উপন্যাসখানির শুধু চিত্র-স্বত্ব ক্রয় ক'রেই ক্ষান্ত হন নি—তার মঞ্চাভিনয়ের স্বত্বও ক্রয় করেছেন! "অন্নপূর্ণার মন্দির"-এর মঞ্চস্বত্ব ক্রয় করার পিছনে প্রিয়বাবুর মনে যে কী সাধু সঙ্কল্প আছে, তা আমরা আজো জানতে পারি নি। আশা করি শীঘ্রই পারবো।

অদূর ভবিষ্যতেই কালী ফিল্মস্-এর কারখানায় "অন্নপূর্ণার মন্দিরের" কাজ আরম্ভ হবে। আপাততঃ ভূমিকা নির্ব্বাচন চলছে।

*

"রূপবাণীতে" কাল থেকে এক সপ্তাহের জন্যে পুনরায় "বিল্বমঙ্গল" দেখানো হবে। "বিল্বমঙ্গল" ইণ্ডিয়া ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রিজের (অধুনা "কালী ফিল্মস্"-এর) সফল চিত্র। আশা করা যায়, আসছে সপ্তাহের প্রতিদিন রূপবাণীর প্রেক্ষাগৃহ দর্শক পরিপূর্ণ থাকবে।

*

পায়োনীয়র ফিল্মস্-এর আর কোন সাড়-শব্দ পাই নি। "মা"র গতি কি হ'ল সে-বিষয়ে সবিশেষ জান্‌বার জন্যে কৌতূহলী আছি। বিশেষ ভরসার কথা ব'লে মনে হচ্ছে না। গতি দুর্গতিতে পরিণত না হ'লেই খুসি হব।

*

নিউ থিয়েটার্সের নবতম হিন্দী ছবি "চণ্ডীদাস" আস্‌ছে কালথেকে চিত্রায় ও নিউসিনেমায় দেখান সুরু হবে। সর্ব্বজনপ্রিয় চণ্ডীদাসের এই হিন্দী সংস্করণে নামভূমিকায় সাইগলকে দেখা যাবে। রামীর ভূমিকায়—উমা!

*

কলকাতা শহরে অধুনা যে দুটী আমেরিকান চিত্র-সম্প্রদায় আসর জাঁকিয়ে বসেছেন, তাঁরা হচ্ছেন প্যারামাউন্ট্ ও রেডিও পিকচার্স! প্যারামাউন্টের প্রতিষ্ঠা আজকের নয়, বহুদিন ধরে তাঁরা এ-দেশের দর্শকদের কাছে শ্রেষ্ঠ সব ছবি পরিবেশন করে এসেছেন। তাঁদের দলে আছেন—আর্ণষ্ট্ লুবিশ, যাঁর চেয়ে বড়ো পরিচালক পৃথিবীতে নেই। তাঁদের দলে আছেন—মার্লেন ডিট্রিক; ফ্রেডরিক মার্চ্চ, যাঁদের পরিচয় দিতে যাওয়া একান্ত অনাবশ্যক।

রেডিও পিকচার্সের তরফে সমান নামকরা নট-নটী বা পরিচালক না থাকলেও, তাঁদের দলের কর্তৃপক্ষদের কর্ম্মশক্তি আছে, ব্যবসায়কে কী ক'রে প্রচার করতে হয়, সে বিদ্যা তাঁরা ভালো করেই আয়ত্ত করেছেন। গত দু-এক সপ্তাহ পূর্ব্বে প্যারামাউন্ট কোম্পানী কলকাতা শহরে একই সপ্তাহে বারোটি চিত্রভবনে তাঁদের ছবি দেখিয়েছিলেন। রেডিও কোম্পানী তার উত্তর দিলেন—সতেরোটি চিত্রগৃহে তাঁদের ছবি প্রদর্শনের আয়োজন ক'রে।

এমনতরো রেশারেশি যে ব্যবসায়ের পক্ষে ভালো, সে-কথা বলছি না। আমি শুধু দু-দলের কর্ত্তাদের কর্ম্মকুশলতার প্রতি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

এই সূত্রে মেট্রোগোল্‌ডুইন মায়ার কোম্পানীর কথা স্বতই মনে আসছে। এমন দিন ছিল, যখন বাঙালী দর্শকদের কাছে মেট্রোর ছবির আদর ছিল সবার অধিক এবং তখন এমন কোন দেশীয় চিত্রগৃহ ছিল না, যে মেট্রোর ছবি দেখবার জন্যে আগ্রহান্বিত না হ'ত। কিন্তু এখন বাঙালীপাড়ায় মেট্রোর ছবি আর দেখা যায় না। দক্ষিণাঞ্চলেও মেট্রোর ছবির সে-চাহিদা আর নেই।

কেন যে এমন ধারা হ'ল, তা গবেষণা করবার বিষয়। তাদের নামকরা নটনটী তো সকলেই প্রায় আছেন—ছবিও নিয়মিত আমরা দেখছি, তবুও মনে হচ্ছে, বাজারে মেট্রোর জনপ্রিয়তা অনেকখানি কমেছে। কেন? সম্ভবত কর্তৃপক্ষদের মধ্যে ব্যবসায়িক কর্ম্মকুশলতার অভাব ঘটেছে। তাঁদের কলকাতার সুযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তা শ্রীযুক্ত নীতিশ লাহিড়ী এখন নাকি আর এ প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে নেই। তাঁর অভাবই মেট্রোর জনপ্রিয়তা হ্রাসের অন্যতম কারণ নয় তো?

নাটকের প্রত্যূষ

(শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য বি এস সি)

মানুষের স্বাভাবিক অনুকরণ-প্রবৃত্তির মধ্যেই নাটকের বীজ নিহিত। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলাধূলোর মধ্যে যে অনুকরণ-প্রিয়তা আমরা দেখতে পাই, সেটাই আদিম যুগ থেকে মানুষের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করেছে ; নাটক, তারই ক্রম-পরিণতি।

খাঁটি নাটকীয়-রূপ গ্রহণ-করবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই অসভ্য বর্ব্বর জাতির মধ্যে নানা রকমের আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান ও উৎসবের প্রচলন ছিল। অঙ্গ-ভঙ্গী-সহকারে নৃত্য ও গীত এই সমস্ত অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল এবং এগুলির মধ্যেই স্বাভাবিক অভিনয়-প্রেরণা অভিব্যক্তি লাভ করেছিল। এই রকমের অনুষ্ঠানগুলির বিশেষত্ব শুধু ধর্ম্ম-সংক্রান্ত হওয়ার মধ্যেই ছিল না—তাদের প্রকৃতি-গত ঐক্যের দিকটাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রায় সর্ব্বত্রই আমরা দেখতে পাই, সেই একই রকমের জীবজন্তু ও মানুষ বলি, নৃত্য-গীত এবং অদ্ভুত অদ্ভুত মুখোস্ ও পরিচ্ছেদের ব্যবহার, অসভ্য প্রকৃতি-উপাসনা এবং গুপ্ত-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে রহস্যময় ও ভীতিপ্রদ নানাবিধ কার্য্য-কলাপের অনুষ্ঠান। এই সমস্ত গুপ্ত-সমিতির উদ্দেশ্য বোঝা কঠিন, অথচ তাদের অনুষ্ঠিত কার্য্যবিধির মধ্যে আশ্চর্য্য-রকম সাদৃশ্য দেখা যায়। দক্ষিণ-সাগর-দ্বীপপুঞ্জের Areoi মহাসমিতি এবং Eleusinian Mysteries অথবা Samothrace দ্বীপের Cabeiric Corporation—এদের প্রত্যেকটিই বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, অথচ যাদের মধ্যে পারস্পরিক সমর্থন বিশেষভাবে বিদ্যমান ছিল। কোন ব্যক্তিকে নিজেদের সম্প্রদায়-ভুক্ত করবার সময় যে সমস্ত অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হোতো, সেগুলিতে সম্প্রদায় পরিত্যাগ করবার শাস্তির আভাস যথেষ্ট পরিমাণে থাকতো ; কিন্তু অন্যদিকে আবার আমোদ-প্রমোদের অভাব ছিল না—সময় সময় দিনের পর দিন ধরে নাচ গান ও সুরাপান চল্‌তো।

এই রকম নাচগান ও উৎসবের মধ্য দিয়ে, গ্রীসে, সর্ব্বপ্রথম নাটকের বিকাশ ও উৎকর্ষ-লাভ ঘটে। গ্রীক-নাটক, তাই সবচেয়ে পুরাতন। আমরা জানি, আড়াই হাজার বছর আগে এই নাটকের জন্ম ও সমৃদ্ধি, কিন্তু সাধারণের উৎসব থেকে কোন্ কোন্ স্তরের মধ্য দিয়ে এই উৎসব নাটকে ক্রম-রূপান্তরিত হ'ল, তার সঠিক ধারাবাহিক কাহিনী আজও নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হয়নি। পণ্ডিতেরা স্বল্প-প্রমাণ ও অনুমানের দ্বারা যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাদের মূলে অনৈক্য অনেক বেশী, ফলে অনেকগুলি মতবাদ গড়ে উঠেছে। আমরা এইরূপ দু'একটি মতবাদের ইঙ্গিত দেওয়ার পূর্ব্বে নাটকের পূর্ব্ববর্ত্তী উৎসবগুলির মোটামুটি চিত্র দেবার চেষ্টা কোরবো।

গ্রীকেরা আমোদ-প্রিয় জাতি ছিলেন ;—তাই বিভিন্ন প্রধান দেবতাদের উদ্দেশে বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন উৎসবের ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক দেবতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ ভাবে এই সব উৎসব অনুষ্ঠিত হোতো। উপাসনা, পুণ্যস্নান, বলিদান ও উপবাসের সঙ্গে সেই সেই দেবতার সম্মানানুযায়ী নাচ, গান ও ক্রীড়া-কৌতুকের বন্দোবস্ত হোতো। Dionysus প্রাচীন গ্রীসের সর্ব্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় দেবতা ছিলেন, কারণ তাঁর উদ্দেশ্যেই সবচেয়ে বেশী সংখ্যক উৎসবের আয়োজন ছিল। তিনি (পরে Bacchus নামেও অভিহিত) গ্রীকদের বসন্ত সুরা প্রভৃতির দেবতা এবং প্রকৃতির উৎপাদিকা-শক্তির অধীশ্বর। গ্রীকদের ধারণায়, তিনিই আঙুরের চারাকে পল্লবিত ও মঞ্জরীত করেন, দ্রাক্ষাকে সুপক্ক করেন। গ্রীসের একটি প্রধান সম্পদ সুরা, তাই উৎসবের মধ্যে প্রথম পেয়ালা তাঁকেই নিবেদন করা হোতো।

এই রকমের উৎসবের মাঝ থেকেই গ্রীক-নাটকের উৎপত্তি। নাটকীয় পর্য্যায়ে আসবার পূর্ব্বে Dionysus-উৎসব মোটামুটি যে ভাবে সম্পন্ন হোতো; তারই কিঞ্চিৎ বিবরণ দেব। কিন্তু এই বিবরণকে Dionysus উৎসবের সম্যক এবং সম্পূর্ণ মূর্ত্তি অনুমান করা অনুচিত হবে। কারণ Dionysus উৎসবে মাত্র একজায়গাতেই হোতোনা—সহরে, গ্রামে সর্ব্বত্রই বহুসংখ্যায় অনুষ্ঠিত হোতো এবং গ্রাম্য উৎসবের প্রকৃতি স্বভাবতই নগরের উৎসবের চেয়ে ভিন্ন ছিল তাছাড়া অনেক পরিবারেও Dionysusএর উৎসব হোতো। Aristophanesএর Acharnians নাটক, একটি কৃষক-পরিবারের মধ্যে এমনি একটি উৎসবের বিবরণ আমরা পাই। সুতরাং বিভিন্ন Dionysus উৎসবগুলোকে সমগ্রভাবে দেখলে মোটামুটি যে সাধারণ বিশেষত্ব-গুলো চোখে পড়ে, নীচে তাই উল্লেখ করা গেল।

বলিদান, এই উৎসবের প্রথম থেকে বিশেষ অঙ্গ ছিল। একটি ছাগকে মিছিল করে বলির স্থানে নিয়ে যাওয়া হোতো। (অনেক সময় Dionysus-এর সঙ্গে Archon Basilus এর পত্নী Basilinna-র বিবাহের শোভাযাত্রাও এর সঙ্গে সম্মিলিত করা হোতো *) এবং এই মিছিল বা 'প্রোসেশন্' ধর্ম্মানুমোদিত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে state-পরিচালিত ছিল। এই

'প্রোসেশনের' সঙ্গে Dionysus-এর প্রস্তরমূর্ত্তি বয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রথা ছিল, কিন্তু যে ক্ষেত্রে অত্যধিক ভারী হওয়ার হেতু, মূর্ত্তি বহন করে নিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য হোতো, সেস্থলে কোন ব্যক্তিবিশেষকে Dionysus সাজিয়ে মিছিলের সঙ্গে শ্রদ্ধাসহকারে নিয়ে যাওয়া হোতো। বিভিন্ন গ্রীক Vase-এর গায়ে অঙ্কিত ছবি প্রভৃতি থেকে জানা যায়, পূর্ণবয়স্ক এবং চুল ও শ্মশ্রু বিশিষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষরূপে Dionysus-এর মূর্ত্তির পরিকল্পনা ছিল। (তরুণ এবং স্ত্রী-সুলভ সৌন্দর্য্যের অধিকারীরূপে Bacchus-এর কল্পনা অনেক পরের।) অমিততেজের নিদর্শন-স্বরূপ তাঁর কপালের ওপর ছোট ছোট দুটো শিং, বসন্তের প্রতিচ্ছবি হিসেবে হাতে Thyrsus-এর দণ্ড এবং ঋতু-নির্ব্বিচারে উৎপাদিকা শক্তির জ্ঞাপনার্থে, মাথায় ivy-র মুকুট ছিল। তাঁর অসামান্য প্রজনন-ক্ষমতার পরিচয় স্বরূপ একটি বৃহৎ Phallus তাঁর সম্মুখে ডালায় করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হোতো। মিছিলের সঙ্গে Dionysus-এর মূর্ত্তির পুরোভাগে একদল কুমারী (canephori) উৎসবের পরিচ্ছদ পরে ভোগ এবং নিবেদনের বস্তু-সামগ্রী ডালায় বহন করে অগ্রসর হোতো এবং পশ্চাদ্‌ভাগে একদল 'ব্যাক্‌কান্টি (Bacchante-ব্যাকসের উপাসিকা) অদ্ভুতভাবে হরেকরকম দলবদ্ধ হয়ে মত্ত অবস্থায় Dionysus-এর অনুগমন কোরতো। এই Bacchante দল ছাগ-চর্ম্মে সজ্জিত হয়ে, উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদ-বিলাসী অরণ্যের নর-ছাগ-দেবতা Satyrদের ভূমিকা গ্রহণ কোরতো। তাদের পরিচ্ছদ সুরা-চিহ্নিত এবং মুখ তুঁতফলের রস অথবা মদের তলানি ময়লা দ্বারা রঞ্জিত। এই দলটি এবং এদের বেশ-ভূষা প্রভৃতি সমস্তই Dionysus-এর যৌনসম্পর্কিত শক্তির রূপান্তরিত (symbolical) পরিচয় ছাড়া কিছুই নয় এবং বর্ত্তমান জগতের চক্ষে যে যথেষ্ট অশ্লীল, সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

* cf History of Theatrical Art—Dr. K. Montzius.

যাই হোক্‌, Dionysus শুধু সুরা প্রভৃতির দেবতাই ছিলেন না—তিনি অন্যমতে মৃত্যুজয়ীও ছিলেন। তাই তাঁর বিজয়-মিছিলের অংশে মৃত-ব্যক্তিদেরও স্থান ছিল। সুতরাং একদল Bacchanteকে এই 'হেডিজ্‌' প্রত্যাগত (Hades—মৃত ব্যক্তিদের আবাস-ভূমি) নিরানন্দ ব্যক্তিদের ভূমিকাও গ্রহণ করতে হোতো। সাদা সীসে দ্বারা মুখে বিবর্ণতা এনে, অথবা সাদা কবরের-পোষাকে আচ্ছাদিত হয়ে এবং মরামানুষের ভয়াবহ মুখোস পরে, এই কাজ তারা সম্পন্ন কোরতো। এদের 'ফ্যালস্‌' বহন করতে হোতোনা, কারণ মৃতব্যক্তিরা যৌন-শক্তিহীন।

এই 'স্যাটির'দের, কবরের পোষাকাবৃত মৃতদেহসমষ্টির এবং উত্তেজিত Ithiphalloi-এর বিরাট মিছিল ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে বলির স্থানে উপস্থিত হোতো। এবং Dionysus-এর উদ্দেশে নৃত্য-গীত কোরতো। সে গানগুলি Dionysus এর জীবনের ঘটনা বর্ননা ক'রে গাওয়া হোতো, সেগুলিকে 'ডিথির‍্যাম্ব' (Dithyramb) বলা হোতো এবং বাঁশী (flute) ও নৃত্যের সাহায্যে গাওয়া হোতো। 'স্যাটির'দের যে দলটি 'ডিওনিসসে'র মূর্ত্তির চারিপাশে নেচে নেচে গান গাইত, তাকে chorus এবং তার দলপতিকে Exarchon নামে অভিহিত করা হোতো। গ্রীক ছাগের নাম 'tragos' হওয়ার জন্য 'ডিথির‍্যাম্বের' সাধারণ নাম 'ছাগ-গীত' ছিল এবং 'ট্র্যাজেডি', 'কোরসে'রই ক্রম-পরিণতি। সুতরাং Dionysus-উৎসবের সরকারী-ধর্ম্ম-বিভাগ পরিচালিত অংশ থেকেই 'স্যাটি'র নাট্য (Satyr-play) এবং 'ট্র্যাজেডি' গড়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে এই নৃত্য, গীত ও অভিনয় অংশে যত বেশী সুচারু ও সুসম্পন্ন হয়ে উঠতে থাকে, ততই এর মর্য্যাদা বাড়তে সুরু করে এবং ক্রমশঃ বেশী পারদর্শিতা ও শিক্ষার আবশ্যক হয়। ফলে, এই বিত্ত-জীবী (professional) সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্য-বিদেরা এগুলির ভার গ্রহণ করে।

উপরে, Dionysus উৎসবের যে বিবরণ-দেওয়া হল, তার মধ্য থেকেই tragedyর উৎপত্তি, আমরা বলেছি। কিন্তু এ মতটি অবিসংবাদী নয়। Aristotle তাঁর poetresএ 'ট্র্যাজেডি'র জন্ম-সম্বন্ধে এই ধারণারই ইঙ্গিত করে গেছেন এবং Prof. Flickinger প্রভৃতি * পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Aristotle, Plato প্রভৃতির প্রমাণ থেকে tragedyর জন্ম যে Dionysus সম্পর্কিত, এই মতবাদের যাথার্থ্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও, আরও অনেকগুলি মতবাদ গড়ে উঠেছে। Dieterich, মৃতদেহ-সৎকার-কালীন গাথা (funeral dirges), Eleusinian Mysteries এবং উৎপত্তির কারণ-নির্ণয়ক-তথ্য প্রভৃতি থেকে নাটকের বিকাশ প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন। Prof. Ridgeway, বীর ও রাজাদের কবরের পারিপার্শ্বিক ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের মধ্যে থেকে এবং Miss Harrison, Year-spirit ও ইন্দ্রজাল প্রভৃতি (sympathetic magic) থেকে tragedyর উৎপত্তি নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। Prof. Murray, Dieterich-Harrison মতবাদের সমন্বয় ও পরিবর্দ্ধনের পক্ষপাতী।

যাই হোক্‌, 'ট্র্যাজেডি'র 'ডিথির‍্যাম্ব' থেকেই উৎপত্তি, মেনে নিলেও আর একটি প্রধান বিষয় অ-সুমীমাংসিত রয়ে যায়। সেটি হচ্ছে কি কি অবস্থার ভেতর দিয়ে এবং কি-ভাবে 'ডিথির‍্যাম্ব' থেকে নাটকের বিকাশ এবং তার সঠিক ধারাবাহিক ইতিহাস কি? ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে uelcker যে মত প্রকাশ করেন অর্থাৎ satyr-play সে Diltyramb থেকে উৎপন্ন tragedy-র মধ্যবর্ত্তী অবস্থা সে মত বর্ত্তমানে প্রায় কোন কোন বিশেষজ্ঞই পোষণ করেন না।

* R. Flickinger—The Greek Drama and its Theater.

Prof. Flickinger বলতে চান, tragedy এবং satyr-play, উভয়েই স্বাধীনভাবে Peloponnesian dittyramb থেকে উৎপত্তিলাভ করেছে। প্রথমটি Corinth এবং Sicyon থেকে Icaria হয়ে Athens এ আসে এবং দ্বিতীয়টির আমদানী Phlins থেকে Atheus-এ Phlius-এ Phlius এর অধিবাসী Pratinus-এর দ্বারা হয়। খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে, Anon সম্ভবতঃ 'ডিথির‍্যাম্বকে' কাব্যমর্য্যাদা দান করেন ("Poetised") এবং সর্ব্বপ্রথম, "নাটক" নামে অভিহিত করেন। তিনি Sesbos-এর অন্তর্গত Methymnaর অধিবাসী কিন্তু Cornithএ বাস করছিলেন। Aristotle এই নাটক (এই সময় থেকে Thespian-এর যুগ পর্য্যন্ত যে ধরণের নাটক সৃষ্টি হয়েছিল) সম্বন্ধে সে উল্লেখ করেছেন, তার সম্ভবতঃ ভুল অর্থ করে সকলে satyr-play বলে বুঝেছেন। প্রকৃতপক্ষে, যতদূর অনুমান সম্ভব, Aristotb-এর বলবার উদ্দেশ্য, এই ধরণের নাটকে (Thespian এবং Pre-thespian) যেরূপ অশ্লীলতা, কুৎসিত ভাষা প্রভৃতির ব্যবহার ছিল যে সেই সময়কার peloponnesian Satyr-drama এবং পরবর্ত্তী, Pratinus-এর satyr playর সঙ্গে এদের বিশেষ পার্থক্য ছিল না। বাস্তবিক, Arvin অথবা সমসাময়িক স্থানীয় নাটকে satyr সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না; Sicyon-এও এর প্রমাণাভাব। Sicyon-এর অধিবাসীরা তাদের পূর্ব্বেকার রাজা Adratusকে অত্যন্ত ভক্তি কোরতো এবং 'কোরসে'র মধ্য দিয়ে সম্মান প্রদর্শন কোরতো। কিন্তু Adrastus-এর শত্রু Clisthenes তার আধিপত্যের কালে (খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৯৫-৫৬০) Adrastus-এর পরিবর্ত্তে এই সম্মান Dionysusকে অর্পণ করে এবং অনুমান ৫৯০ অব্দে কাব্য-নাট্য-প্রতিযোগীতার জন্য ছাগ-পুরস্কারের প্রচলন করে। এই ছাগ পুরস্কারের প্রচলন থেকেই সম্ভবতঃ tragedy নামের উৎপত্তি। Thespis, Peloponnesus থেকে, Icariaয় Dithomamb-এর মধ্যে ছন্দের সন্নিবেশ, ও ছাগ-পুরস্কার প্রভৃতি আনয়ন করেন এবং 'কোরসে'র নেতাকে 'কোরস' থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে আবৃত্তি করবার স্বাধীনতা দেন। এই ব্যতিক্রমের দ্বারা 'ডিথির‍্যাম্বে' নাটকীয় বিশেষত্ব সর্ব্বপ্রথম প্রবেশ লাভ করে। তিনি এই প্রকার নাটককে Dionysus-সম্পর্কিত আখ্যান-বস্তুর বাধ্যতা থেকেও মুক্ত করেন এবং অন্যান্য দেবতা, বীর ও মহাত্মা প্রভৃতির কাহিনী 'ডিথির‍্যাম্বে'র বিষয়-বস্তু করেন। A theus এ খৃঃ পূঃ ৫৩৪ অব্দে City Dionysiaর উদ্বোধন হয় এবং Thespis প্রথম ছাগ-পুরস্কার পান।

উপরোক্ত বিবৃতি থেকে tragedyর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা কিছু ধারণা করতে পারি। নাটক বলতে, প্রধানতঃ আমরা নাটকের দুটী বিভাগকে বুঝি—tragedy এবং comedy। সুতরাং Comedyর সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধেও কিছু জানা, আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ ক্ষেত্রেও তেমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন। Tragedyর মত Comedyর উৎপত্তি বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট বাদানুবাদ আছে। উপরন্তু, Aristote, tragedy সম্বন্ধে যেরকম আলোচনা করে গেছেন সে রকম কোন বিবরণ comedy সম্বন্ধে রেখে যান নি এবং তিনি লিখে গিয়ে থাকলেও, সেটি দুর্ভাগ্যক্রমে অধুনালুপ্ত। আমরা শুধু মোটামুটি ভাবে 'কমেডি'র সৃষ্টি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করে এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের শেষ কোরবো। যে মতটি নীচে দেওয়া হোলো সেটা যে সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য, এমন দাবী করা যায়না।

যতদূর সম্ভব, Comedy-ও Dionysus উৎসব থেকেই জাত। এই উৎসবের 'ষ্টেট্' পরিচালিত ধর্ম্ম-সংক্রান্ত অংশ থেকে যেমন tragedyর উৎপত্তি, তেম্নি, স্বেচ্ছায় সাধারণের যোগদানের অংশ থেকেই Comedyর জন্ম। Dionysusএর মিছিলে, Bacchus এবং Phallie symbol এর ভক্ত, কতকগুলি লোক স্বেচ্ছায় যোগ দিতে সুরু করে। তারা সরকারী পক্ষের নিয়োজিত লোক না হলেও সাধারণ দর্শক শ্রেণীর চেয়ে স্বতন্ত্র ছিল। তারা আমোদপ্রিয় দল গঠন করে রথ বা গাড়ীতে চড়ে সহরের মাঝখান দিয়ে, শোভাযাত্রার পেছনে পেছনে যেত, Dionysus এবং Phallie Symbol-এর মহিমা কীর্ত্তন করে গান গাইত এবং দর্শকের ভিড়ের সঙ্গে ঠাট্টা তামাশা কোরতো। এই দলের কৌতুক, ক্রীড়া প্রভৃতি শীঘ্রই লোকপ্রিয়তা অর্জ্জন করে এবং Dionysus মিছিলের অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে ওঠে।

প্রথম প্রথম এই দলের সভ্যেরা সাধারণ পোষাকে যোগ দিত কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই 'উলেন টিউনিক' ও চামড়ার আচ্ছাদনের একরকম পোষাক পরে এবং মাথায় ivy, violet সুগন্ধি thyme-এর শাখা ও acanthus-এর পাতায় তৈরী মুকুট দিয়ে উৎসবে আসতে থাকে। তাদের কোমরে 'বেল্টে'র সঙ্গে অথবা ঘাড় থেকে, কৃত্রিম Phallus ঝোলানো থাক্তো। এইজন্য তাদের Phallophoroi ('ফ্যালস্-ধারী) বলা হোতো।

এই স্বেচ্ছায় যোগদানকারী ভ্রাম্যমান দলের নাম komos ছিল। যে গানগুলি তারা গাইত, প্রথম প্রথম সেগুলি পূর্ব্ব-রচিত থাকতো না—প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে সেইখানেই তৎক্ষণাৎ তৈরী করে নেওয়া হোতো। পরে এই komos-এর মধ্য থেকে কতকগুলি আমোদী-যুবক একটি ছোট দল তৈরী করে এই গানগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়। komos থেকেই সম্ভবতঃ এই দলের নাম Comic chorus এবং তাদের গানকে comedy নাম দেওয়া হয়।

— —

সগৌরবে দ্বিতীয় সপ্তাহ

ক্রাউন টকি হাউসে

শনিবার ২৪শে মার্চ্চ হইতে

ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের

প্রথম ও শ্রেষ্ঠ বাংলা সবাক চিত্র

শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি

প্রযোজক—শ্রীপ্রফুল্ল রায়

চিত্রশিল্পী—শ্রীবিভূতি দাস
শব্দশিল্পী—শ্রীসমর ঘোষ

সুরশিল্পী—শ্রীনিতাই মতিলাল
নৃত্যশিল্পী—শ্রীমতী নীহারবালা

নাম ভূমিকায়—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী

— বিভিন্ন ভূমিকায় —

শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য্য
শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী (অন্ধগায়ক)
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী
শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ
শ্রীমতী ইন্দুবালা

মোহন নৃত্য-গীত !
অপরূপ দৃশ্যপট !
অনবদ্য অভিনয় !
নিখুঁত পরিচালনা !

— বিভিন্ন ভূমিকায় —

শ্রীমতী শেফালিকা
শ্রীমতী সুহাসিনী
শ্রীমতী দেববালা
শ্রীমতী নীহারবালা
শ্রীমতী পদ্মাবতী
প্রভৃতি।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা | সম্পাদক— শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায় | ১৬ই চৈত্র ১৩৪০

রেডিও পিকচার্সের Flying Down to Rio চিত্রের একটী দৃশ্য
শীঘ্রই ম্যাডান থিয়েটার্সে প্রদর্শিত হবে

কলালাপ

আজ ফরাসী সাহিত্যের গৌরবময় যুগের একটি কাহিনী বলব। সে-সময়ে Flaubert, Edmond de Goncourt, Alphonse Daudet ও Emile Zola—এই বিশ্ববিখ্যাত চতুর্মূর্ত্তি সেখানকার সাহিত্য জগতে সগৌরবে বিচরণ করছেন। তখন Floubert তাঁর নির্দ্দোষ রচনারীতিকে অসম্ভব-রূপে নিখুঁৎ ক'রে তোলবার জন্যে নিজের জীবনী-শক্তিকে দিনে দিনে ক্ষীণতর ক'রে তুলছেন, হিংসুক Goncourt তাঁর রোজনামচায় সমসাময়িক সাহিত্যিকদের উদ্দেশে বিষ ছড়াচ্ছেন, Zolaর ক্রমবর্দ্ধমান জনপ্রিয়তা দেখে Daudet-এর মন তিক্ত-বিরক্ত হয়ে উঠছে এবং বন্ধুদের ক্ষুদ্রতার দিকে দৃষ্টিপাত না ক'রে Zola বাস্তব জীবনের মধ্যে নব নব সৃষ্টির স্বপ্ন দেখছেন। Flaubert তখন ফরাসী সাহিত্যের গুরু এবং অন্য তিনজন ছিলেন তাঁর শিষ্যস্থানীয়। Romantic movement তখন মৃত। Stendhal ও Balzac-এর অনুসরণে তখনকার ফরাসী সাহিত্যিকরা Naturalism নিয়ে মত্ত হয়ে আছেন। ও সব কথা আর একদিন বলব।

*

প্রকৃতিবাদ বা Naturalism যখন Zolaকে অসীম খ্যাতি এনে দিলে, তখন তাঁর সঙ্গে যে-কয়জন তরুণ লেখক এসে যোগদান করলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন Gue de Maupassant, J. K. Huysmans, Henry Ceard ও Leon Hennique। এঁদের দলে পেয়ে Zola ভারি খুসি হয়ে উঠলেন এবং বয়সে বড় হয়েও এঁদের সঙ্গে সমবয়সীর মতন মেলামেশা করতে লাগলেন। এঁদের কেউ কেউ তখন দু-একখানি বই লিখেছেন, কেউকেউ তখনো আত্মপ্রকাশ করেন নি। এঁদের কারুর প্রকৃতি কারুর সঙ্গে মেলে না, কিন্তু তবু সকলে মিলে এঁরা এমন একটি বন্ধু-মণ্ডলী গঠন করেছিলেন, যাঁর মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সঙ্গ কামনা করতেন। এঁদেরি দলের একজন (Alexis) সত্য কথাই বলেছিলেন, "The finest time is that of debuts. Afterward, once in mid-career, we always go our own way, worry about our own skin." Zolaর মতন এঁদের প্রত্যেকেরই একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল, নিত্যদৃষ্ট সংসারে যা হচ্ছে একান্ত সাধারণ, তাই অবিকল 'ফোটো' গ্রহণ করা। আপিসে, রাস্তায়, বাজারে, কফিখানায় বা জামা-কাপড়ের দোকানে প্রতিদিন জীবনের যে-সব ছবি দেখা বা যে-সব কথাবার্ত্তা শোনা যায়, তার উপরে একটুও রং না ফলিয়ে এঁরা গল্প-

উপন্যাসে সেইগুলিকেই ধ'রে রাখতেন। দৃষ্টির এই সংকীর্ণতার মধ্যেই ছিল তাঁদের সাহিত্যিক-জীবনের পরম আনন্দ।

*

ফরাসীদেশের Cafe বা কফিখানাগুলি ওখানকার সাহিত্য ও আর্টের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছে। এবং এ প্রভাব সব-সময়ে মঙ্গলদায়কও হয় নি। এই কফিখানায় কেবল কফি নয়, খাদ্যও পাওয়া যায়, কোথাও কোথাও নারী ও মদও মেলে। ফ্রান্সের নানা বিভাগের শিল্পী ও সাহিত্যিকরা এই-সব কফিখানায় এসে সমবেত হন। অনেকে সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত এইখানেই ব'সে লেখাপড়া করেন বা ছবি আঁকেন। অনেকে অলস গল্পগুজবে পরমানন্দ উপভোগ করেন। কফিখানার মালিকরাও সাহিত্যিক ও শিল্পীদের জন্যে কম উপকৃত হয় না, কারণ বিখ্যাত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নামের মহিমায় কফিখানাগুলিও এতটা বিখ্যাত হয়ে ওঠে যে, সাধারণ খরিদ্দারের অভাব তাদের কখনো অনুভব করতে হয় না। ... ... ফরাসী কফিখানা আর্ট ও সাহিত্যের উপকারও করেছে অনেক। নানা-ক্ষেত্রের নানা শিল্পীর জন্যে সে এক সাধারণ মিলন-আসরের প্রতিষ্ঠা করেছে এবং শিল্পীরা এখানে এসে পরস্পরের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান ক'রে আপন আপন শক্তিকে অধিকতর দৃঢ় ক'রে তুলতে পারেন। ফরাসী আর্ট ও সাহিত্যের যে-সব আন্দোলনের প্রভাব আজ পৃথিবীর সব দেশের—এমন কি বাংলাদেশেরও—উপরে এসে পড়েছে, তার অধিকাংশেরই উৎপত্তি হয়েছে সর্ব্বপ্রথমে এই সব কফিখানার মধ্যেই। সাহিত্য ও আর্টের লীলাগার এই-সব কফিখানার কাহিনী অতি বিচিত্র, তাও আর একদিনের জন্যে তোলা রইল।

*

"Mother Machina" নামে একটি কফিখানা ছিল, Maupassant প্রমুখ তরুণ প্রকৃতি-বাদী সাহিত্যিকের দল সেইখানে গিয়ে আলাপ-আলোচনা, খাওয়া-দাওয়া ও হৈচৈ করতেন। সেখানকার খাবার মোটেই ভালো ছিল না। মাংস এত শক্ত যে দাঁত দিয়ে টেনে ছেঁড়াই যেত না। কিন্তু কফিখানার মালিক ছিলেন খুব খোস-মেজাজী লোক এবং যে-মদ তিনি পরিবেশন করতেন তার কড়া ঝাঁঝ চট্ ক'রে মাথায় চ'ড়ে যেত। অতএব এখানকার কোন দোষই কেউ গ্রাহ্যের মধ্যে আনা উচিত মনে করতেন না। Huysmans নিজেই স্বীকার করেছেন "এখানকার খাওয়া রীতিমত ভীতিজনক ও ঘৃণাকর। কিন্তু আহারে অত আনন্দ আমরা আর কোথাও পেতুম না।"

*

এই নবীন সাহিত্যিকের দল ওখানে জড়ো হয়ে কি করেন তাই জানবার জন্যে কৌতূহলী Zola, "Mother Machina"র কফিখানায় এসে হাজির হ'লেন। নিম্নশ্রেণীর যে-জীবনকে প্রকৃতিবাদী Zola বলতেন "সত্যিকার জীবন", কফিখানার ভিতরে এসে তিনিই অস্থির হয়ে উঠলেন! তাঁর দম যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল, গা কেমন-কেমন করতে লাগল। কোন আলোচনাতেই মনে-প্রাণে তিনি যোগ দিতে পারলেন না, তারপর সেখান থেকে পালিয়ে তিনি যেন বাঁচলেন—সেই একদিনেই তাঁর সকল কৌতূহল মিটে গেল। প্রকৃতিবাদীদের আর-একটি আড্ডা বসত Maupassant-এর বাসায়। সেখানে একমাত্র পুরুষ-বাসিন্দা ছিলেন তিনিই—অন্য যারা থাকত তারা সবাই স্ত্রীলোক এবং এমন স্ত্রীলোক যে 'অসতী' ব'লে ডাকলে তারা মানহানির মামলা আনতে পারত না। এই আড্ডাতেও সাহিত্য ও প্রকৃতিবাদ নিয়ে গভীর আলোচনা চলত এবং Zolaও সেখানে মাঝে মাঝে হাজির থাকতেন। কিন্তু তথাকথিত নারীজাতির দিকে Zolaর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না ব'লে নবীন প্রকৃতিবাদীরা তাঁর সামনে যতটা-সম্ভব সংযমের পরিচয় দিতেন। Zola বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সুন্দরীরা এসে দেখা দিতেন এবং তারপরই মাংস ও নারীর সঙ্গে জাগত প্রকৃতিবাদের উচ্চ কলরব! ... ... কিন্তু এঁদের সব-চেয়ে বিচিত্র মিলন-বাসর বসত Zolaর বাগান-বাড়ীতে।

*

বাগান-বাড়ী বলতে ঠিক যা বোঝায়, Zolaর এ-বাড়ী ঠিক তাই ছিল না—একে তাঁর পল্লী-আবাস বলাই উচিত, কারণ অনেক সময়েই এখানে তিনি বাস করতেন। পাশ্চাত্য দেশের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও শিল্পীরাই আর্টের সাধনা করবার ও স্বপ্ন দেখবার জন্যে এম্‌নি সব পল্লী-প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে নাগরিক জনতা ও কোলাহলের অত্যাচার থাকে না, সেখানে বাইরে থাকে বর্ণ-বিচিত্র প্রকৃতির আশীর্ব্বাদ এবং ভিতরে থাকে স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র এবং অন্যান্য শিল্পের বহুমূল্য দুর্লভ নিদর্শন: প্যারিসহর থেকে খানিক দূরে Medan নামক গ্রামে Zolaও এইরকম এক সাধনালয় তৈরি করিয়েছিলেন। Maupassant-এর একখানি নৌকা ছিল, তার নাম "Nana" (Zolaর একখানি বিখ্যাত উপন্যাসের নাম)। তিনি অন্যান্য নবীন প্রকৃতিবাদী সাহিত্যিকদের নিয়ে নিজেই দাঁড় টেনে দীর্ঘ জলপথ পার হয়ে মাঝে মাঝে Zolaর পল্লাবাসে গিয়ে হাজির হতেন। সেখানে নদীর মাঝখানে Zolaর নিজের একটি তরুছায়ামধুর দ্বীপ ছিল, তারই উপরে গিয়ে উঠে প্রকৃতিবাদীরা সাহিত্যের বিদ্রোহ-কোলাহলে গগন বিদীর্ণ করতেন। এবং ঐখানেই ছয়জন লেখকের লেখা বিশ্বসাহিত্যে সুবিখ্যাত সেই পুস্তকের—"The Soirees of Medan—জন্ম হয়। (১৮৮০ খৃষ্টাব্দ)

*

Maupassant-এর (মোপাসাঁ) নাম আজ কেবল বিশ্বসাহিত্যে নয়, বঙ্গ-সাহিত্যেও (যে-কোন প্রসিদ্ধ বাঙালী সাহিত্যিকেরই মতন) সুপরিচিত। ছোটগল্পে আজও তিনি অতুলনীয়, অমরতা তাঁকে গ্রহণ করেছে। কিন্তু যে-সময়ের কথা বলছি, তখন অল্প-স্বল্প কিছু-কিছু লিখেও সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি অপরিচিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত লঘু-প্রকৃতির আমুদে লোক, সাহিত্য-গুরু Flaubert-এর সর্ব্বপ্রধান শিষ্য হয়েও তিনি নিজের দিকে কারুর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পারতেন না। তাঁর লেখার চেয়ে তাঁর অনাচার ব্যভিচার নিয়েই লোকে বেশী মাথা ঘামাত।

*

Zolaর পল্লীগৃহে কেমন ক'রে The Soirees of Medan পুস্তকের জন্ম হয়, সে-সম্বন্ধে Maupassant-এর নিজের মুখের কথাই উদ্ধার ক'রে দিলুম: "পল্লীগ্রামের একটি নিদাঘ নিশীথ—চন্দ্রকরে সুন্দর। ... ... আমাদের মধ্যে একজন এইমাত্র নদীতে সাঁতার দিয়ে উঠে এলেন। আর একজন পায়চারি করছেন, তাঁর মগজের মধ্যে পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে বৃহৎ বৃহৎ চিন্তার উদয় হচ্ছে!

আমাদের আহারাদি শেষ হয়েছে। তিনজন সাধারণ ঔপন্যাসিকের পেটে যা ধরে ততটা খাদ্য উদরস্থ ক'রে Zola ব'সে আছেন। গল্পস্বল্প হচ্ছে। ভবিষ্যতে তিনি কি উপন্যাস লিখবেন, সাহিত্যের কোন্ আদর্শ তিনি মানেন, নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর কি মতামত, Zola এই-সব কথা বলছেন। Zolaর দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ। একটু তফাতে ঘাসের গোছা রয়েছে, তার দিকে আঙুল তুলে আমরা বললুম, "ঐ একটা পাখী!" Zola অমনি ঘাসের গোছার দিকে টিপ্ ক'রে বন্দুক ছুঁড়লেন, কিন্তু পাখী

তবু যরল না দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন। এমন ব্যাপার হামেসাই হ'ত। কোন কোন দিন আমরা মাছ ধরতে বসতুম। Hennique‌এর ছিপে মাছের পর মাছ উঠত, কিন্তু Zolaর ছিপে উঠত হয়তো পুরাণো, ফেলে-দেওয়া বুটজুতো!

এম্‌নি এক জ্যোৎস্নাপুলকিত সন্ধ্যায় আমরা যখন Merimee ও Hugoর মুণ্ডপাত করছি, Zola হঠাৎ ব'লে উঠলেন, "এস, আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে গল্প শোনাই।"

আমরা হেসে বললুম "তথাস্তু"। ঠিক হ'ল, গল্পের গঠন হবে একরকম, কিন্তু বিভিন্ন হবে কেবল ঘটনাগুলি।

Zola তখন ফ্র্যাসী-জার্ম্মান যুদ্ধ নিয়ে যে গল্পটি বললেন তার নাম হচ্ছে, "The Attack on the Mill"।

পরের দিন আমার পালা এল। (মোপাসাঁ যে-গল্পটি বলেছিলেন, তার নাম "Ball-of-fat, সেটি তাঁর প্রথম গল্প হ'লেও বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে) এইভাবে পালাক্রমে সকলেই এক-একটি গল্প বললেন।"

সব গল্পই ফরাসী-জার্ম্মান যুদ্ধের গল্প। (এর মধ্যে মোপাসাঁর গল্পটি বাংলায় অনূদিত হয়েছে। এবং জোলার "The Attack on the Mill" নামক অপূর্ব্ব সুন্দর গল্পটি অনুসরণ ক'রে চব্বিশ-পঁচিশ বছর আগে নাচঘর-সম্পাদকও 'ভোরের পুরবী" নামে একটি গল্প লিখেছিলেন।)

*

Zola বলছেন, "আমরা কেউই মনে করতুম না যে Maupassant‌এর কোন শক্তি আছে।" কিন্তু Maupassant যখন তাঁর গল্পটির পাঠ সাঙ্গ করলেন, তখন প্রত্যেকেই দাঁড়িয়ে উঠে একবাক্যে স্বীকার করলেন যে, এটি হচ্ছে একটি 'masterpiece'! ... ... "The Soirees of Medan" প্রকাশিত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য সাফল্য! ঐ পুস্তকের ছয়জন লেখকের মধ্যে একমাত্র Zolaই ছিলেন সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত, বাকি পাঁচজনের নাম বন্ধুমহলের বাইরে কেউ জানত না বললেই হয়। কিন্তু ঐ বইখানি বৃহত্তর জনসাধারণের সঙ্গে তাঁদের পরিচয়সাধন ক'রে দিলে। Hennique তারপর থেকে ক্রমাগত উপন্যাস ও নাটক লিখতে সুরু করলেন এবং Free Theatre আন্দোলনে যোগ দিয়ে যথেষ্ট নাম কিনলেন এবং Zolaও তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "বেশ, বেশ, আমাদের দলের কেউ যদি নাট্যজগৎ জয় করে, সে বড় আনন্দের কথা!" Henry Ceard পরে যে নিখুঁৎ 'Naturalistic novel" ("A Fine Day") লিখে দেশজোড়া নাম কিনলেন তা এমনি অদ্ভুত যে, সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে কোন ঘটনাই ঘটে নি! Alexis সাংবাদিক ও নাট্যকার রূপে সুপরিচিত হলেন। Huysmans-এর নামও আজ বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে জল্ জল্ করছে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী ভাগ্য ফিরল Maupassant-এর। "The Soirees of Medan" প্রকাশের পর ধরতে গেলে একটিমাত্র ছোট গল্পের দ্বারা একদিনেই তিনি জনসাধারণের প্রাণের বন্ধু হয়ে পড়লেন। তাঁর পরের রচনা La Maison Tellier-এর প্রচার হ'ল বিস্ময়জনক।

Maupassantও বিপুল উৎসাহে তখন সাহিত্যকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করলেন—কেতাবের পর কেতাব তাঁর নাম নিয়ে বাজারে বেরিয়ে হু-হু ক'রে বিকিয়ে যেতে লাগল। তাঁর লেখা বই ছাড়া ফ্রান্সের রমণীদের দিন আর কাটে না। কিছু-বেশী দশবৎসরের মধ্যে তাঁর ত্রিশখানি বই আলোকের মুখ দেখলে। তাঁর গুরু Flaubert তাঁকে এই মন্ত্র শিখিয়েছিলেন, "কলাবিদ ব'লে যে আত্মপরিচয় দিতে চায়, সাধারণ মানুষের মতন জীবনযাপন করবার অধিকার তার নেই।" এই গুরুবাক্যকে Maupassant নিজের জীবনে বড় অতিরিক্ত-রূপে সফল ক'রে তুলতে গেলেন অসম্ভব সব উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা। যখন তিনি নৈতিক অধঃপতনের শেষ-সীমায় গিয়ে পৌঁছলেন, তাঁর দেহ তখন আর সইল না, তিনি একেবারে পাগল হয়ে গেলেন এবং সেই অবস্থায় করলেন আত্মহত্যা। মৃত্যুর বহুদিন আগে থেকেই যে উন্মাদ-রোগ ধীরে ধীরে তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তাঁর কতকগুলি রচনার মধ্যে সে প্রমাণেরও অভাব নেই। এই ভাবে মাত্র দশবৎসরের মধ্যে এক বিস্ময়কর ও অতুলনীয় প্রতিভার আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটল।

*

Flaubert-এর যে-বচনটি একটু আগেই উদ্ধার করলুম, এখন ও-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্। কেবল Flaubert নন, Hugo এবং আরো কোন কোন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কলাবিদ ঐ-রকম কথা ব'লে গেছেন। ও-সব কথার ভিতরে খানিকটা সত্য হয়তো আছে, কারণ পৃথিবীর সব দেশেই দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, অধিকাংশ প্রসিদ্ধ শিল্পীই পঙ্কতিলক পরতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন নি। অমন যে জিতেন্দ্রিয়-রূপে বিখ্যাত কবি ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, তাঁরও গুপ্তপ্রেমের অবৈধ মিলনে জাত কন্যার সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবীতে একেবারে নিষ্কলঙ্ক শিল্পী যে নেই, তা বলছি না, কিন্তু তাঁদের সংখ্যা কত অল্প! এ-সম্বন্ধে Flaubert ও Hugo প্রভৃতির মত্ আরো একটু স্পষ্ট হ'লেই ভালো হ'ত। তাঁদের ঐ-সব মতামতের ভিতরে কি যুক্তি আছে? সৃষ্টির মধ্যে বাস ক'রেও শিল্পীরা কেন সৃষ্টিছাড়া জীব হবেন? তাঁদের কি যুক্তি হচ্ছে এই যে, একসঙ্গে বিষ ও অমৃত নিয়ে শিল্পীদের যখন কারবার, তখন ও-দুটি জিনিষের স্বরূপ বোঝবার জন্যে তাঁরা নিজেরাও অমৃতের সঙ্গে বিষ পান করতে বাধ্য? আলোক তো সবাই দেখতে পায়, তার ভিতরে কি থাকে তাও কারুর অদেখা নয়, কিন্তু অন্ধকারকে দূর থেকে দেখলে যে কিছুই দেখা হয় না এ কথা খুবই সত্য বটে। অন্ধকারের ভিতরে কি আছে তা দেখতে হ'লে আমাদেরও অন্ধকারের গর্ভে ঢুকে চারিদিকে হাতড়ে দেখে বুঝতে হয়। অবশ্য এ বিপদজনক কাজে ভয়ও যথেষ্ট। অন্ধকার-সাগরে ডুবে রত্ন খুঁজতে গিয়ে অনেক ডুবুরী অতলে তলিয়েও যান, তার প্রমাণ হচ্ছেন Verlain, Oscar Wilde, Villon ও Edgar Allan Poe প্রভৃতি। George Morland-এর মতন চিত্রকর ও Edmund Kean-এর মতন অভিনেতাও ডুব দিয়ে আর অন্ধকারের বাইরে আসতে পারেন নি। কৌতূহলী হয়ে এঁরা শক্তির সীমা অতিক্রম করেছিলেন। শিল্পীরা অসাধারণ মানুষ হ'তে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের দুর্ব্বলতা থেকে তাঁরাও মুক্ত নন,—কতখানি অগ্রসর হওয়া উচিত, এ জ্ঞান তাঁদেরও অনেকের থাকে না। এক সময়ে একদল ফরাসী কবিরা সত্যসত্যই পণ ক'রে বসেছিলেন যে, মদ্যপান না ক'রে তাঁরা কিছুতেই লেখনীধারণ করবেন না!

শিল্পীদের এই অসাধারণতা ওদেশের সাধারণ লোকেরাও মেনে নিয়েছে, তাই নমস্য ও শ্রদ্ধাস্পদ শিল্পীদের প্রকাশ্য দুর্ব্বলতা দেখলেও প্রতীচ্যের কেউ বিস্মিত হয় না। এদেশী শিল্পীরা যে-সব গোপন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পেলে লজ্জায় অধোবদন হন এবং যে-সব কথা প্রচারিত হ'লে জনসাধারণের চোখে তাঁরা যার-পর-নাই খাটো হয়ে পড়েন, ও-দেশে জনসাধারণের কাছে সেই-সব কাহিনীরই আদরের সীমা থাকে না এবং সে-সব কাহিনী পড়বার পরেও শিল্পীদের প্রতি কারুর শ্রদ্ধা একতিলও কমে না। পরস্ত্রীহরণ করতে গিয়ে Hugo একবার বিপদে পড়েছিলেন, George Sand-এর নারীত্ব সারা-যৌবন অগুন্তি লোকের কাছে আত্মদান ক'রেও তৃপ্ত হয় নি, জরাগ্রস্ত হবার পরেও ভৃত্যের প্রেমও তাঁর কাছে লোভনীয় ছিল, Esadora Duncan অসংখ্যবার পর-পুরুষের আলিঙ্গনে আপন যৌবনকে দান করেছিলেন, বৃদ্ধ Dumas যুবতী নারী পেলে আর কিছু চাইতেন না এবং বৃদ্ধ Anatole Franceও একটা সমগ্র দেশের ও জাতির অভিনন্দন প্রত্যাখ্যান ক'রে সামান্য এক নটীর দেহ নিয়ে মেতে উঠেছিলেন,—কত আর নাম করব? কিন্তু এ-সব কাহিনী ওখানকার জনসাধারণের চোখে শিল্পীদের সম্মানকে একটুও মলিন করতে পারে নি, বরং তাঁদের নামকে যেন অধিকতর রঙিন ক'রে তুলেছে! অনেক স্থলে এই সব দুর্ব্বলতার ইতিহাস শিল্পীরা নিজেরাই অম্লান-বদনে অসঙ্কোচে প্রকাশ ও প্রচার ক'রে নিজেদের অসাধারণতা দেখিয়েছেন —বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেনের মত সাফাই গাইবার চেষ্টামাত্র করেন-নি। ও-দেশের শিল্পীরা সগর্ব্বে প্রচার করতে চান—আমরা হচ্ছি অসাধারণ, আমরা হচ্ছি, 'বোহিমিয়ান', আমরা পায়ে সমাজের শৃঙ্খল পরি না,—আমরা স্বাধীন, আমরা বিদ্রোহী!" প্যারিসহরের কফিখানাগুলিতে যাও, দেখবে সে কী বাঁধন-হারা উৎসব! সেখানে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে, উচ্চনাদে বাজনা বাজছে, মদের পিয়ালার পর পিয়ালা আসছে, এবং প্রায়-নগ্ন-বেশে রূপসী যুবতীরা হাসছে-গাইছে-নাচছে এবং তাদের সঙ্গে অবাধে মিলে-মিশে দেশ-বিখ্যাত কবি ও শিল্পীরা সর্ব্বসাধারণের সামনে যা-খুসি বেলেল্লাগিরি করছেন! এ ব্যাপার সেখানে এতটা সাধারণ ও স্বাভাবিক যে এ-সব নিয়ে কোন কুৎসাই রটে না, কারুরই মাথা ঘামে না এবং ঐ শিল্পীদের বিরুদ্ধে কোন শান্তশিষ্ট গৃহস্থেরই দরজা বন্ধ হয় না!

•

কিন্তু ঐ-সব অসাধারণ শিল্পীর বাস্তবতা ও প্রকৃতিবাদের দ্বারা পৃথিবীর লাভ হয়েছে কতখানি? তাঁদের সাহিত্য কয়টি ভদ্র ও মহৎ চরিত্র দেখাতে পেরেছে? Balzac, Zola, Maupassant ও Huysmans প্রভৃতির সৃষ্টির মধ্যে প্রাধান্য লাভ করেছে অল্প-বিস্তর পরিমাণে যত নিম্নশ্রেণীর কদর্য্যতা—যত "Unbalanced men, scoundrels, thieves, prostitutes, drunkards, stupid dreamers, unhealthy peasants, degraded workers, unclean bourgeois, cowardly soldiers, avaricious ministers, feeble artists, hysterical priests" প্রভৃতি, প্রভৃতি। বাস্তবতা ও প্রাকৃতিকতার দোহাই দিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একান্ত একদেশদর্শীর মত ওঁরা কেবল পাতালের ভিতরেই ছুটাছুটি ক'রে বেড়িয়েছেন, পাতালের উপরে যে পৃথিবীর আলোক-সাম্রাজ্যের সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ নিশিদিন বয়ে যাচ্ছে, এ সত্য কেউ দেখতে বা মানতে চান নি। এঁদের চোখে ছিল এমন পরকোলা, যার ভিতর দিয়ে তাকালে দৃষ্টিও হয়ে যায় বিকৃত এবং আলোও দেখায় অন্ধকারের মত। অন্ধকার বাস্তবও হ'তে পারে, প্রকৃতও হ'তে পারে, কিন্তু এই বৃহৎ ও বিচিত্র বিশ্বে অন্ধকারই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য? এইজন্যেই প্রকৃতিবাদের অন্যতম জনক Flaubertকেও শেষটা

বলতে হয়েছিল, "Cursed be the day that I had the fatal idea of writing 'Madame Bovary !" ... ... Remy de Gourmont বললেন, "The trend of the new generation is rigorously anti-Naturalistic. It is not a matter of partisanship; we simply depart with disgust from a literature whose baseness makes us vomit." প্রকৃতিবাদের অন্যতম মহা পাণ্ডা Huysmansও বললেন, "We are done with Naturalism. In every direction... Masturbation has been novelized. Belgium has given us an epic of syphilis. I believe that in the realm of pure scientific observation we may as well stop there. ... ... It is a blocked tunnel, into which Zola with his great drum-beating has led us." Anatole France বললেন, "Naturalism is finished. La Terre was not the work of an accurate realist, so much as of a perverted idealist."

*

প্রকৃতিবাদীরা বাস্তবতার পূজা করতে গিয়ে এমন-এক মড়কের জন্ম দিয়েছিলেন, যার ভয়ে শেষটা তাঁদের নিজেদেরই ত্রস্ত ও ব্যস্ত হয়ে উঠতে হয়েছিল! ফরাসী সাহিত্যে এ পরীক্ষা একবার হয়ে গিয়েছে, এখন বাংলা সাহিত্যের আধুনিক আদর্শ দেখে মনে হচ্ছে, এতদিন পরে এখানেও বুঝি এই বহু-পরীক্ষিত পুরাতন ও সাংঘাতিক বিষয়টি নিয়ে নব-পরীক্ষা সুরু হ'তে চলল! এখানকারও অনেক সাহিত্যিক বাস্তবতা বলতে বুঝেছেন কেবল ড্রেনের ময়লা-ঘাঁটা! তাঁরা আধুনিকতার মুখোস প'রে আমাদের হাতে যা দান করছেন তা হচ্ছে ফরাসী সাহিত্যের সেই সেকেলে ফেলে-দেওয়া জিনিষ। বিশেষজ্ঞের চক্ষে তার মধ্যে আর কিছুমাত্র নূতনত্ব বা চাকচিক্য নেই। আমরা রুচিবাগীশ নই—আমরাও বাস্তবতার পক্ষপাতী। তবু আবার প্রশ্ন করছি, অন্ধকার বাস্তবও হ'তে পারে, প্রকৃতও হ'তে পারে, কিন্তু এই বৃহৎ ও বিচিত্র বিশ্বে অন্ধকারই কি একমাত্র দ্রষ্টব্য?

*

নগ্নগাত্র নগ্নপদ রবীন্দ্রনাথ—কোলে তাঁর খোকা! ন্যাংটা-পা আর ন্যাংটা-পায়ের মুলুক এই বাংলা এবং রবীন্দ্রনাথ এইখানেই জন্মেছেন বটে। কিন্তু তবু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের উপর-উক্ত মূর্ত্তি কোনদিন আপনার চোখে পড়েছে কি? যদি না প'ড়ে থাকে তাহ'লে গেল হপ্তায় যে "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"র কথা বলেছি, তার পাতা উল্টে দেখুন। "প্রিয়-পুষ্পাঞ্জলি"তে আরো কয়েকখানি চিত্তাকর্ষক ছবি আছে। গেল-বারে উল্লেখ করতে ভুলেছিলুম।

*

কলকাতার চারটি বাংলা রঙ্গালয়ই এখন যে-সব পালা অভিনয় করছে বা করতে উদ্যত হয়েছে, তার একখানিও নবীন লেখকের লেখা আধুনিক নাটক নয়। হয় পৌরাণিক পালা, নয় উপন্যাসের নাট্যরূপ! ব্যাপার কি? আধুনিক নাটকলেখকরা কি দেশত্যাগী হয়েছেন, না থিয়েটারের মালিকরা তাঁদের উপরে নির্ব্বাসন-দণ্ড দিয়েছেন?

*

কলকাতায় আরো দুটি ছোট রঙ্গালয় আছে—"চিপ্‌ থিয়েটার" ও "রঙমহল"। ওখানেও দেখি সাধারণতঃ পুরাণো কাসুন্দীই ঘাঁটা হয়। নবীন লেখকরা সহজে ওদিক মাড়াতে রাজি নন। তাঁরা হেলে ধরবার অভ্যাস না ক'রেই কেউটে ধরতে উৎসুক—একেবারেই মহা-নাট্যকারে পরিণত হবার জন্যে ব্যগ্র! 'সাধনা' কথাটির একটি আভিধানিক অর্থ আছে। লেখনী-চালনা করতে শিখেই কেউ মহা-নাট্যকার মূর্ত্তি ধারণ করতে পারে না। আমাদের পরামর্শ হচ্ছে, নবীন নাট্যকাররা তাঁদের কচি পালা নিয়ে যেন আগে ছোট ছোট রঙ্গালয়ে যান। ওখানে নানা-রকম পরীক্ষার সুযোগ আছে এবং ওখানে গেলে সেই সবচেয়ে দরকারি কথাটি বুঝতে পারা যাবে—গ্যালারির দেবাদিদেবগণ কোন্ মন্ত্রে তুষ্ট হন!—রঙ্গালয়ের উপযোগী নাটক যে অনেকেই লিখতে পারেন না, তার একমাত্র হেতু হচ্ছে, নবীন নাট্যকাররা জনসাধারণের মনের সঙ্গে পরিচিত নন।

*

"রঙমহল" আবার একখানি নূতন নাটক খুলেছেন। কিন্তু কই, এবারে আর প্রকাশ্য অভিনয়ের আগে সমালোচকদের জন্য বিশেষ অভিনয়-রাত্রির ব্যবস্থা করবার জন্যে কোন আগ্রহই দেখছি না কেন? এক পৌষেই শীত পালালো,—আমরা এর সমর্থন করি না। তবে এজন্যে বিস্মিত হবার কারণ নেই। আমরা বরাবরই দেখে আসছি, বাংলা রঙ্গালয়ের অধিকাংশ নূতন বিধি-ব্যবস্থাই টঁ্যাকসই হয় না। কারণ তাদের জন্ম হয় হাল্‌কা খেয়ালে। মান্ধাতার কল্পনা-রাজ্যে বাস করতে করতে মাঝে মাঝে আচম্বিতে তাঁদের মনে প'ড়ে যায়, নবযুগ এসে তাঁদের দ্বারে অপেক্ষা ক'রে ক'রে শ্রান্ত হয়ে পড়েছে! চারিদিকে অমনি সাড়া জাগে। তাড়াতাড়ি সাদরে দরজা খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু তারপরেই, নবযুগের একখানা হাত বা পা কিম্বা নাকের ডগাটি দরজার ভিতরে ঢুকতে না ঢুকতেই কে এসে কেন যে ফের দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়, সে-রহস্য কিছুই বোঝা যায় না। বন্ধদ্বার অন্ধ-কোটরে আবার মান্ধাতার তন্ত্র-মন্ত্র শুনতে থাকি। ... ...

*

শোনা যাচ্ছে, কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের উপন্যাসের নাট্য-রূপের জন্যে প্রয়োগকর্ত্তা শ্রীযুক্ত সতু সেন নাকি কোমর বেঁধে কাজ করছেন। ভালো কথা। তাঁর শ্রমের সফলতা কামনা করি।

*

আর একটি সুখবর। "নাট্যমন্দিরে" নূতন নাটকের মহলায় শিশির-কুমার নাকি আবার আগেকার মত একাই একশো হয়ে নিয়মিত-রূপে পরিশ্রম করছেন। তাহ'লে আমরা অনায়াসেই আশা করতে পারি যে, এবারে শিশিরকুমার আমাদিগকে নূতন-কিছু দেখাবেন নিশ্চয়ই? আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, শিশিরকুমার এখনো তাঁর মস্তিষ্ক ও নূতন-কিছু দেখাবার শক্তি হারান নি। তাঁর আধুনিক অপরাধ হচ্ছে, আলস্যের আনন্দ প্রায়ই একেবারে তাঁকে পেয়ে বসে। কাজ করবার ক্ষমতা থেকে তিনি বঞ্চিত হন নি—কিন্তু কাজ তিনি করেন না এই যা দুঃখ।

*

"নাচঘরের" পাতায় একটি "সঙ্কলন" বিভাগ খোলা হ'ল। বিভিন্ন পত্রিকা থেকে—বিশেষ ক'রে অতীত দিনের পুরাণো পাতা থেকে—ভালো রচনা (যে সকল লেখা নাচঘরের এলাকার মধ্যে আসতে পারে) চয়ন করে দেওয়া হবে। এই সঙ্কলনের ভার নিয়েছেন আমাদের অন্যতম সাহায্যকারী স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এই সংখ্যায় "ভ্রংমা" শীর্ষক যে লেখাটি ছাপা হ'ল তার লেখককে আমরা জানি। যে বিষয়ে তিনি লিখেছেন, সে-বিষয়ে অধিকার তাঁর

যথেষ্টই আছে। এই সুযোগে তাঁর প্রতি এবং "বিচিত্রা"-র প্রতি আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। রচনাটি "বিচিত্রা"র পুরাণো সংখ্যা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

*

নিজস্ব প্রতিনিধি লিখছেন—

কয়েকদিন আগে বাগবাজার নাট্য-সমাজের তরুণ সভ্যেরা "নাট্যনিকেতন" রঙ্গগৃহে "আলমগীর" ও "মানময়ী গার্লস্ স্কুলে"র অভিনয়-আসর বসিয়েছিলেন। বাঙালীদের সখের দলের মধ্যে, দু-একটি সম্মানীয় ব্যতিক্রম ছাড়া, সময়ানুবর্ত্তিতার যে অভাব থাকে, উক্ত দলের সভ্যেরা সে অভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেন নি দেখা গেল ; ফলে সমগ্র অভিনয়টি দেখবার সুযোগ আমাদের ঘটে নি। যতটুকু দেখেছি, তাতে এই সত্যটি নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে, উক্ত সমাজের অভিনেতৃবর্গ (দুচারজন ছাড়া) নিজেদের ভূমিকাগুলিকে দুরস্ত করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি ; ফলে তাঁদের অভিনয় কোথাও বিশেষ পীড়াদায়ক হয়-নি। অভিনেতৃদের মধ্যে যাঁদের অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন, শ্রীযুক্ত মোহন ঘোষ (উদিপুরী) ; শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল সেনগুপ্ত (আলমগীর) ; শ্রীযুক্ত অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় (রামসিংহ) ; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (ভীমসিংহ) ও শ্রীযুক্ত সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় (রাজসিংহ)। এতদ্ব্যতীত অন্য সকলের ভূমিকাও মন্দ অভিনীত হয় নি। আশা করা যায়, ভবিষ্যতে এই সম্প্রদায়টি যখন অভিনয়ের আসরে নামবেন, তখন তাঁরা নাটক-নির্ব্বাচনে অধিকতর রুচি ও সংস্কৃতির পরিচয় দিতে সক্ষম হবেন।

——

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

ধরণীর খেলাঘরে খেলি আমি কত খেলা,
খেলি আর কাঁদি আর গান গাই সারাবেলা।

•

জীবনের খেলাঘরে, পুতুলেরা খেলা করে,
কে গড়ে লুকিয়ে ব'সে জীবন্ত মাটির ঢেলা!

•

মরণের খেলাঘরে চিতা-গীতা শুনি ভাই!
তবু হাসে নীলিমায় চাঁদিমার রোশনাই!

•

মহা-যবনিকা ঠেলি, বল আর কত খেলি?
কে তুমি আমায় গ'ড়ে কর এত অবহেলা?

——

চিত্রপুরী : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : চণ্ডীদাস (হিন্দী সংস্করণ)

প্রধান ভূমিকায়—শাইগল, শ্রীমতী উমা, পাহাড়ী সান্যাল, নবাব প্রভৃতি।

নিউ-থিয়েটার্সের এই নূতন ছবিখানি গত সপ্তাহে "চিত্রা" এবং "নিউ-সিনেমায়" একসঙ্গে আরম্ভ হয়েছে।

*

হিন্দী চণ্ডীদাসের সমালোচনার প্রারম্ভে সর্ব্বাগ্রে এর পরিচালক নিতীন বসুকে অভিনন্দিত করি। হিন্দী-চণ্ডীদাসের পরিচালনার কাজে, তার কারু-সজ্জা-রচনায় এবং তার সিনেরিওর লিপি-কৌশলের মধ্যে নিতীনবাবু যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, সে ক্ষমতা সাধারণের অনেক ওপরে। এই ছবির মধ্যে একাধারে পেয়েছি শ্রেষ্ঠ রূপদক্ষের সদা-জাগ্রত অন্তর্দৃষ্টি এবং তারই সঙ্গে টেকনিক্ ও অভিনয়ের উৎকর্ষের পরিচয়। নিতীনবাবু যে-ভাবে অগ্রবর্ত্তী চণ্ডীদাসের ভিতর থেকে নীর পরিত্যাগ ক'রে ক্ষীরটুকুকে তুলে নিয়েছেন, তা দেখে তাঁর বুদ্ধি ও রসবোধের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পাচ্ছিনে।

*

অভিনয়ের মধ্যে একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম এই যে, প্রত্যেক অভিনেতাই সংযম-গুণের অধিকারী হ'য়ে সু-অভিনয় করেছেন। অভিনেতাদের মধ্যে সব-চেয়ে আমাদের আকৃষ্ট করেছে, শ্রীযুক্ত নবাবের অভিনয়। এই অভিনেতাটির মধ্যে এমন একটি সহজ অথচ সতেজ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে, যা তাঁর অভিনীত অংশ-কে ভারাক্রান্ত না ক'রে তাকে প্রদীপ্ত ক'রে তোলে। শ্রীযুক্ত নবাবের 'ইহুদি-কি-লেড়কী'-র অভিনয় আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে; হিন্দী-চণ্ডিদাসে তাঁর অভিনয়টিও সহজে বিস্মৃত হব না।

*

শ্রীমতী উমার কথা বেশী বলা বাহুলা। এইটুকু বল্লেই যথেষ্ট হবে যে, বাংলা দেশের ছায়াচিত্র-জগতে তাঁর কাছাকাছি দাঁড়াতে পারে, (পাশে তো দূরের কথা) এমন অভিনেত্রীর দর্শন আমরা আজো পাই নি। হিন্দী-চণ্ডীদাসে বাঙালী-মেয়ে শ্রীমতী উমার অভিনয় বাঙালী ও বাঙলার গৌরবের বস্তু।

*

সাইগল মোটের ওপর আমাদের তৃপ্তি দিয়েছেন। তাঁর মধুর কণ্ঠের গানগুলি আমাদের খুবই ভালো লেগেছে।

পাহাড়ী সান্যালের অভিনয় বেশ ভালো লেগেছে। গানগুলিও মন্দ লাগেনি। এই সূত্রে এ-কথাটি না বল্লে সত্যের অপলাপ করা হবে— "চণ্ডীদাস"-ছবিতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্রের দরদ-ভরা কণ্ঠের অভাব আমরা অনুক্ষণ বোধ করেছিলাম। তাঁর সেই মর্ম্মস্পর্শী উদাত্তকণ্ঠের সুর-ঝঙ্কার—যে শুনেছে, সে বোধ করি কোনদিনই ভুলবে না।

হিন্দী-চণ্ডীদাসের মধ্যে অভাব ঘটেছে একটি জিনিষের ;—চণ্ডীদাসের মধ্যে যে বেদনা-মধুর কাব্য আছে,তার অন্তর্নিহিত সুরের আভাস কোথাও স্পষ্ট ক'রে আমরা অনুভব করতে পারিনি—যেমনটি পেয়েছিলাম বাঙ্লা-চণ্ডীদাসে!

অন্যদিকে, অর্থাৎ টেক্নিকের উৎকর্ষে এবং অভিনয়-সৌষ্ঠবে উনি-থিয়েটার্সের হিন্দী-চণ্ডীদাস বাঙ্লা-চণ্ডীদাসকে অতিক্রম করেছে।

*

চিত্রায় আজ থেকে নিউ-থিয়েটার্সের হাসির ছবি "মাপ করবেন মশাই" আরম্ভ হ'ল। এই নূতন-ধরণের হাস্য-রসাত্মক ছবিখানি নাকি সব দিক দিয়ে বিস্ময়কর অভিনবত্বের পরিচয় দেবে। ছবিখানি দেখবার জন্যে আমরা আগ্রহান্বিত হ'য়ে আছি।

গ্রেটা গার্ব্বোর নূতনতম ছবি "কুইন্ ক্রিশ্চিনা" লণ্ডন সহরে দেখানো হচ্ছে। সে-সম্বন্ধে বিলাতের সমালোচক লিখছেন :—

গ্রেটা গার্ব্বোর "কুইন্ ক্রিশ্চিনা" এই সহরে অবিসম্বাদী সাফল্য অর্জ্জন করেছে। দু'-একজন সমালোচক, যাঁরা আজও পর্য্যন্ত গ্রেটার অভিনয়-শক্তির প্রতি বিমুখ ছিলেন, এই ছবি দেখে তাঁরা স্তব্ধ হয়েছেন। গ্রেটা গার্ব্বো এই ছবিতে জয়লাভ ক'রে তাঁর আসনকে অনাগত অনেক দিনের জন্যে চিত্র-জগতের শীর্ষ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর চিন্তিত হবার কারণ নেই।

আরো এক কারণে "কুইন্ ক্রিশ্চিনা" বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হয়েছে,—তা হচ্ছে জন্ গিল্বার্টের সু-অভিনয়। একদা জন্ গিল্বার্ট রুডল্ফ্ ভ্যালেন্টিনোর মতো জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন; কিন্তু টকির প্রচলনের পর তাঁর সেই লোকপ্রিয়তার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে এবং অবশেষে তিনি চিত্রজগৎ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হন। সেই জন্ গিল্বার্ট্ এত দিন পরে ফিরে এসেছেন; তাঁর এই "প্রত্যাবর্ত্তন" জয়-মণ্ডিত হয়েছে।

*

ক্যাথরিন্ হেপ্বার্ণ্ ওদেশের একজন নূতন অভিনেত্রী; কিন্তু নূতন হ'লে কি হয়, অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর Fan Mail অন্য অভিনেত্রীদের চেয়ে ভারি হ'য়ে উঠেছে—ক্যাথরিণ হেপ্বার্ন্-এর নামে সিনামার টিকিট্ঘরের কর্ত্তারা আজ বিশেষ ভাবে উল্লসিত হ'য়ে ওঠেন;—তাঁর নামে চিত্রগৃহ দর্শক পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকে দিনের পর দিন, সন্ধ্যার পর সন্ধ্যা, রাতের পর রাত।

এই শক্তিশালিনী অভিনেত্রীর অভিনয়-প্রতিভা যাতে সর্ব্বতোভাবে বিকাশ লাভ করতে পারে, সেই জন্যে তাঁর পরিচালকবৃন্দ তাঁর জন্যে বিশেষ ভাবে তিনখানি বই নির্ব্বাচিত করেছেন। এই বই তিনখানির মধ্যে একখানি হচ্ছে—বার্ণার্ড শ'র সেন্ট্ জোয়ানের চিত্র-সংস্করণ; দ্বিতীয় খানি হচ্ছে, রাজ্ঞী এলিজাবেথের কাহিনী অবলম্বনে রচিত Tudor Wench নামক নাটকের চিত্র-সংস্করণ এবং শেষের খানি হচ্ছে Prelude to Love—যে ছবিতে তিনি একজন বিখ্যাত স্ত্রী-ঔপন্যাসিকের ভূমিকায় দেখা দেবেন।

এই ছবি তিনখানি যদি পরিচালকবৃন্দের আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করে, তা'হলে তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, আগামী বৎসরে ক্যাথরিণ হেপ্বার্ণের নাম অভিনেত্রী-তালিকার সর্ব্বপ্রথমে দেখা যাবে।

*

মিস্ মেরি এলিস্ বিলাতের মঞ্চ-অভিনেত্রীরূপে দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। শ্রীমতী বহুদিন পর্য্যন্ত চিত্র-প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তাদের লোভনীয় প্রস্তাব-সমূহ উপেক্ষা ক'রে রঙ্গমঞ্চের ওপরেই তাঁর অভিনয়-প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন; কিন্তু টকির আহ্বান অন্য অনেকের মতো তাঁর নিষ্ঠাকেও টলিয়ে দিয়েছে—শ্রীমতী এতদিন পরে ছবিতে অভিনয় করতে রাজী হয়েছেন। রবার্ট্ হিচেন্স্-এর সর্ব্বজন-বিদিত উপন্যাস Bella Donna-র চিত্র-সংস্করণে তাঁকে দেখা যাবে। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করবেন, কন্রেড্ ভেড্ ও সার সেড্রিক্ হার্ডউইক!

*

"রূপবাণী"তে কাল থেকে প্যারামাউন্টের ছবি I am no Angel দেখানো হবে। এই ছবিতে স্বনামধন্যা অভিনেত্রী মে ওয়েষ্ট অভিনয় করেছেন। ইতিপূর্ব্বে এই বছর ষষ্ঠ সংখ্যার "নাচঘরে" উক্ত ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করেছি ব'লেই এ-সংখ্যায় আর বিশেষ কোন কথার অবতারণা করলাম না।

সঙ্কলন

ড্রামা

(শ্রীঅষ্টাবক্র)

১

"The audience, entirely Indian, chews pan and, unabashed, chatters throughout the performance"—(Victor John on "Natya-Mandir" in "Drama" Nov. 1928)। আমি না হয় মেনে নিচ্ছি যে আমরা পান খাই এবং গল্প করি। পান খাওয়া এবং গল্প করা—দুই অসঙ্গত, কিন্তু অসুন্দর নয়। য়ুরোপের কয়েক থিয়েটারে, দর্শকের মধ্যেই, আমি অসুন্দরের পরিচয় পেয়েছি। কিন্তু এর চর্চ্চা আমি আর করব না, যেহেতু তা অশোভন।

মিঃ জন্ নাট্যমন্দির সম্বন্ধে কত কী বলেছেন। দু'এক জায়গায় অভিনয়ের প্রশংসাও করেছেন। তাঁর নিন্দা-প্রশংসার কোন মূল্য নেই; কারণ, তাঁর লেখা যুক্তিহীন, এবং ভাষা অসংযত। * অতএব তাঁর অভিমতের আলোচনা করবার কোন দরকার নেই। এই সূত্রে আমি দেশের ড্রামা নিয়ে ভেবেছি। ভেবে গর্ব্বিত হ'তে পারি নি। না হবার কারণ,—আমাদের দেশে উচ্চশ্রেণীর ড্রামার অভাব। একথা বলার দায়িত্ব আমি জানি।

ড্রামার বাংলা নাটক কিংবা অভিনয় নয়। কারণ, ড্রামা ও-দুই, এবং তাছাড়া আরো কিছু যার কথা আমি পরে বলব। আমরা যখন ড্রামা সম্বন্ধে ভাবি তখন ভাবি নাটক কিংবা অভিনয় সম্বন্ধে। ড্রামার আর্ট সমষ্টিমূলক। এ কথা আমরা জানি না, যদি জানি ত মানি না। এইটেই হচ্ছে আমাদের প্রথম ভুল।

আমাদের দ্বিতীয় ভুল এর চেয়ে গুরুতর। আমরা fromএর মহত্ত্ব স্বীকার করি না; ভাবি আইডিয়াই আসল, অনুভূতিই সব। এটা জড়বাদ এবং স্থূল জিনিষের প্রতি অশ্রদ্ধা। আইডিয়া জাগে অনুভূতিতে। কিন্তু অনুভূতি ত সকলেরই থাকে, অবশ্যি কারও কম, কারও বেশী। যদি অনুভূতিই হ'ত সব, তা হ'লে সকলেই হ'ত আর্টিষ্ট। কেউ হয়ত বলবেন যে আর্টিষ্টের অনুভূতি খুবই গভীর। আমি মানি। কিন্তু তার অনুভূতির চেয়েও গভীর অনুভূতি থাকে অনেকের। মার যখন একমাত্র ছেলে মারা যায় তখন কি তার চেয়েও অধিক ব্যথিত হয় আর্টিষ্ট? তবু মৃত্যুর ট্রাজাডি ফুটে ওঠে তারই রচনায়। কারণ, মার মূক, নীরব দুঃখকে সে সরব ক'রে তোলে—তাকে রূপ দিয়ে। এই রূপই হচ্ছে আর্টের উৎকর্ষ। আর্টিষ্টের প্রথম সাধনা—রূপান্বেষণ (a search for form)-এর সফলতার উপরই নির্ভর করে আর্টের মর্য্যাদা এবং আর্টিষ্টের প্রতিষ্ঠা।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে এর এক সুন্দর উদাহরণ আছে। বাল্মীকির আগেও হয়ত অনেকে ব্যাধকে পাখী মারতে দেখেছিলেন; শোকাভি-

* "While at longer intervals, a single player passed the fore-stage, dismally wailing the dirge of pre-destined doom. The make-ups of the players, too, in their depth of unreality, as also the wigs in their patent artificiality, suggested the Character-marks of the Attic stage……The anachronisms were staggering." ইনি মহারাণা প্রতাপ দেখতে যান।

ভূতও হয়েছিলেন নিশ্চয়।' কিন্তু যে দিন প্রথম বাল্মীকির মুখ থেকে বাণী ফুটে উঠল সেই দিনই ব্রহ্মা বললেন—"শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।" ব্রহ্মা এমন 'সার্টিফিকেট' দিয়ে তাঁর রূপদক্ষতার পরিচয় দিলেন। অর্থাৎ, তিনি স্বীকার করলেন যে আর্টের জন্ম এবং বিকাশ অনুভূতিতে নয়, অনুভূতি-প্রকাশে।

আমাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে এই যে আমরা সব সময়ে formকে এক তুচ্ছ উপাদান ব'লে হেসে উড়িয়ে দিই। আমি যদি বলি অনেক সময়ে আইডিয়া নয়, fnrmই আসল তাহলে অনেকে হাসবেন। কিন্তু এ কথা সত্য। একটা উদাহরণ নেওয়া যা'ক।

সোজা ভাষায় হ্যামলেটের আইডিয়া এই: "এক ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী এবং তাদের ছিল এক ছেলে। রাণী ভালবেসে ফেলে আর একজনকে, যে রাজাকে খুন করে আর রাণীর সঙ্গে করে বিয়ে ছেলেটা সম্বপ্ন হ'য়ে ভূত-প্রেতের কথা শোনে এবং কতগুলো হত্যা করে।" *

* ইব্‌সেনের Doll's Houseএর আইডিয়া ইব্‌সেনেরই ভাষায় এই: – Spiritual conflicts oppressed and bewildered by the belief in authority, she loses faith in her moral right and ability to bring up her children. Bitterness. Love of life, of children, of family. Here and there a womanly shaking off of her thought. Sudden return of anxiety and terror. She must bear it all alone. The catastrophe approaches inevitably, inexorably. Despair conflict, and destruction."

(Ibsen's workshop vol. X. p. 92.)

কিন্তু ইব্‌সেনে যদি এই লিখে ছেড়ে দিতেন তা হ'লে কেউ তাঁকে বড় বলত না।

কিন্তু শেক্‌সপীয়ারের হ্যামলেট যে এই নয় তা সকলে জানেন। সে এক অমর সৃষ্টি,—আর্টিষ্টের গভীর অনুভূতির চরম প্রকাশ। এই প্রকাশেই হচ্ছে হ্যামলেটের সৌন্দর্য্য। শেক্‌সপীয়ারের অনেক আইডিয়া ইতিহাস থেকে নেওয়া। শুধু আইডিয়া নিয়েই যদি আলোচনা করা যায় তা হ'লে শেক্‌সপীয়ার যে শুধু মৌলিক ন'ন—তা নয়, তিনি অপহারক। কিন্তু আমরা শেক্‌সপীয়ারকে তা বলি না, বলি আর্টের মহারথী; স্রষ্টা। Formএর জন্যই তাঁর মহত্ব। এর জন্যই আমরা হ্যামলেটের চেয়েও বড় বলি শেক্‌সপীয়ারকে। বিধাতা যদি কেবল ইচ্ছাই করতেন, তা হ'লে কেউ তাঁকে স্রষ্টা বলত না। তিনি সৃজনও করলেন। শুধু স ঐক্ষ্যৎ নয়—স অসৃজৎ। এই সৃজনের মূলে রয়েছে রূপ—form.

তা হ'লে আমরা বলতে পারি যে আর্টের অর্থই হচ্ছে এই রূপসৃষ্টি। এমন সৃষ্টির উপাদান ভিন্ন ভিন্ন আর্টে আলাদা এবং এই উপাদানগুলির মূল্য সৃষ্টির মতনই অসাধারণ; তার সমকক্ষ। কবির উপাদান ভাষা এবং ছন্দ। ড্রামার উপাদান ত্রিবিধ: কথা, অভিনয় এবং ষ্টেজ। ক্রমানুসারে, ড্রামার স্রষ্টা তিন জন; নাটককার, অভিনেতা এবং ষ্টেজের কর্ত্তা—Producer। প্রাচীন যুগে নাটককারেরই মহত্ব ছিল সবার চেয়ে বেশী, আজকাল তিনজনেরই সমান। আমি 'ড্রামাটিষ্টের উপাদান' না লিখে 'ড্রামার উপাদান' লিখলাম এই জন্য। কথা নিয়েই ড্রামা হয় না; নাটককারই সব নয়।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
১০ম সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২৩শে চৈত্র
১৩৪০

কলালাপ

সকল দেশেই সাহিত্য-সেবকদের উপরে রঙ্গালয় চিরকালই বিচিত্র মায়া-জাল বিস্তার ক'রে এসেছে। এবং রঙ্গালয়ও, যখনি দরকার হয়েছে তখনি কেবল নাট্যকারদের নয়, কবি ও ঔপন্যাসিকদেরও সাহায্য গ্রহণ করতে একটুও ইতস্তত করেনি।

*

রঙ্গালয়ের ভিতরে দাঁড়াবার ঠাঁই পেলে সাহিত্য-শিল্পীরা হাতে-নাতে জনসাধারণের মন পরখ করবার সুযোগ পান। তাঁদের লেখা আবালবৃদ্ধবনিতার ভাবের ঘরে কি-রকম কাজ করে, চোখের সামনে সেটা দেখে তার 'থ্রিল্' বা উত্তেজনা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। কেবল কাগজে-কলমে জনসাধারণের সঙ্গে যাঁদের পরিচয়, তাঁদের কাছে এটা একটা মস্ত লোভনীয় ব্যাপার!

রূপলেখার একটী দৃশ্য

*

মহাকবি Goethe কেবল রঙ্গালয়ের ভক্ত ছিলেন না,—সুদীর্ঘকাল ধ'রে রঙ্গালয় পরিচালন ক'রেও বিখ্যাত হয়েছিলেন। সাধারণ সাহিত্যক্ষেত্রের এ-বিভাগে তাঁর অদ্বিতীয়তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। বড় Dumas-এর সাহিত্য-সাধনা সুরু হয় নাট্যজগতেই। Hugo রঙ্গালয়ের জন্যে অল্প পরিশ্রম করেন নি। উনিশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যের মহারথরা—Balzac, Flaubert, Goncourt, Daudet ও Zola প্রভৃতি—পাদপ্রদীপের আলোকে পতঙ্গের মতন আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যদিও সে আলো তাঁদের কাছে হয়ে দাঁড়িয়েছিল স্পর্শাতীত আলেয়ার আলোর মত! এখানে আরো অগুন্তি নাম করা যায়, কিন্তু নামের সংখ্যা বাড়াবার দরকার নেই।

*

অনেকেই মত জাহির করেছেন, সাহিত্য-জগতে সব-চেয়ে শক্ত কাজ হচ্ছে নাটক লেখা। এবং উপন্যাস লেখা নাকি নাটক-রচনার চেয়ে ঢের সোজা। এ মত হজম করবার আগে একটু নেড়ে-চেড়ে দেখা যাক্। Balzac, Flaubert, Goncourt, Daudet ও Zolaর মতন ঔপন্যাসিকরা চেষ্টা ক'রেও ভালো বা সচল নাটক লিখতে পারেন নি বটে। কিন্তু এর দ্বারা কিছুই প্রমাণিত হয় না। কারণ ঐ-সময়েই ওঁদের চেয়ে নিকৃষ্ট ঔপন্যাসিকরাও নাট্যজগতে বিশেষ যশ অর্জ্জন করেছিলেন। ওদিকে Hugo ও বড় Dumaর নাটকগুলি যেমন রঙ্গালয়ের ভিতরে আনন্দ বিতরণ করত' সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁদের উপন্যাসগুলিও তার চেয়ে কম খুসির খোরাক যোগায় নি। ছোট Duma, Strindberg, Galsworthy, Gorky ও আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঔপন্যাসিকরূপে সুপরিচিত হয়েও শ্রেষ্ঠ নাটক রচনায়ও যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। Bernard Shaw ভালো নাটক লিখেছেন, কিন্তু চেষ্টা ক'রেও ভালো উপন্যাস লিখতে পারেন নি। গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যায়। এ-সব নজির কিছুই নয়, এ-রকম সক্ষমতা ও অক্ষমতার উপরে কিছুই নির্ভর করে না!

*

আমাদের মতে, আর্টের কোন বিভাগেই সফলতা অর্জ্জন করা সহজ নয়। কবি উপন্যাস লিখতে এবং ঔপন্যাসিক কাব্য-রচনা করতে না পারলে কাব্য বা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠতা বা অপকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় না। যাঁর মনের গতি যে পথে, যাঁর সাধনা যে-ক্ষেত্রে, সেই পথে বা ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধি। মন অনুকূল হ'লে পৃথিবীর সব-চেয়ে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। কিন্তু যাঁর ধাত উপন্যাস রচনার উপযোগী, তাঁর পক্ষে নাটক লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তাই Zolaর নাটক প'ড়ে ফরাসী সমালোচকরা মতপ্রকাশ করেছিলেন, "A great novelist gone astray… like Balzac'! আবার নাট্য-ক্ষেত্রই যাঁর যোগ্য স্থান, উপন্যাসের দিকে দৃষ্টি দিলে তিনিও বিশেষ সুবিধা করতে পারবেন না। এ পরীক্ষাও অনেক

বার হয়ে গেছে। Hugo, Duma, Strindberg, Galsworthy, Gorky ও রবীন্দ্রনাথের মত প্রতিভা সকলের থাকে না।

*

একদিক দিয়ে নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক, দুজনেরই কাজ এক। তাঁরা দুজনেই গল্প বলেন ও চরিত্র সৃষ্টি করেন। দুজনের কাজ এক বটে, কিন্তু দুজনের কাজ করবার পদ্ধতি এক নয়। নাট্যকার রচনা করেন দৃশ্যকাব্য, তাই নাটক তখনি রূপ পায়, যখন রঙ্গমঞ্চের উপরে তা অভিনীত হয়। রঙ্গমঞ্চের দিকে চোখ ও নিজেকে আড়ালে রেখে নাট্যকারকে কল্পনা খেলাতে হয়, তাই মঞ্চের উপরে অভিনীত হবার সুযোগ না পেলে নাটক অনেকটা খোঁড়ার মতন হয়ে থাকে। নাট্যকার যা দেখান না, সেটুকু দেখাবার ভার নেন নট-নটীরাই। ঔপন্যাসিকের এ সুবিধা নেই। নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে পাঠকের মনের ভিতরে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তাঁকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়। পাঠকের সামনে থেকে তাঁকে বুঝিয়ে দিতে হয় তিনি কি বলতে বা দেখাতে চান। রচনা-পদ্ধতির এই বিভিন্নতার জন্যে, যিনি উপন্যাস লিখতে অভ্যস্ত তাঁর পক্ষে যেমন নাটক রচনা করা কঠিন, তেমনি নাটক-রচনায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তির পক্ষেও উপন্যাস লেখাও বড় সহজ ব'লে মনে হবে না। মোট কথা, আমরা ঔপন্যাসিককে নিম্ন-আসন দিতে প্রস্তুত নই। Balzac শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হ'তে পারেন নি বটে, কিন্তু কোন শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও যে Balzac-এর মতন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক হ'তে পারেন নি, এ সত্যটাও আমরা সহজে ভুলতে পারছি না।

*

কল্‌কাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলে এপ্রিল মাসের শেষার্দ্ধে যে অপূর্ব্ব-সুন্দর নাচের আসর বসবে, আমরা এখন থেকেই তার আশায় দিন গুণছি। বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি, ব্রহ্মদেশের লোকেরা নৃত্যকলায় আশ্চর্য্যরূপে নিপুণ। দু-একবার ওদেশী একান্ত-সাধারণ নাচিয়েদের সামান্য যে-টুকু নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে পূর্ব্ব ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়েছে। তারপর যখন অমর রুশ-নর্ত্তকী আনা পাব্‌লোভার জীবনীতে ব্রহ্মদেশীয় নাচ সম্বন্ধে পড়লুম, "These dances contained much boldness and humour and were executed, apparently without any effort, but undoubtedly with great mastery and very rhythmically, and were in parts technically very difficult," তখন আমাদের মন সেই না-দেখাকে দেখ্‌বার আগ্রহে অধীর হয়ে উঠল। পাব্‌লোভা ভারতীয় নাচ দেখে মোটেই অভিভূত বা তুষ্ট হন নি, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় নৃত্য দেখে তিনি সবিস্ময়ে আরো অনেক প্রশংসা ক'রে গেছেন। তাঁর মতে নাচে এমন অপূর্ব্ব দেহভঙ্গী, এমন নিগূঢ় সমগ্রতা ও এমন সাবলীল ছন্দ পৃথিবীর আর কোন দেশেই নেই। ব্রহ্মদেশীয় নাচ দেখে তাঁর স্বামী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন—"How long a period is necessary to master all this?" এবং পাব্‌লোভা দেখে-শুনে শেষটা স্থির করেছিলেন যে, "it could not be learnt, but was rather some inherited quality, the result of racial customs" প্রভৃতি। পাব্‌লোভার মতন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তকী যে নাচ শেখা অসম্ভব ব'লে মনে করেছিলেন, সে কি-রকম নাচ? কিন্তু মনের প্রশ্ন এতদিন মনের ভিতরেই থেকে গিয়েছিল, কারণ নাচের আর-একটি সংস্কৃত নাম হচ্ছে "দৃশ্য-সঙ্গীত", পরের মুখে ঝাল খেয়ে বা কেতাবের পাতা উল্টে যা বোঝা যায় না, যা উপলব্ধি করতে হ'লে নাচের আসরে গিয়ে স্বশরীরে হাজির হওয়া দরকার। এতদিন তাই ব্রহ্মদেশ আমাদের ডাকছিল, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার সময় পাই নি।

কিন্তু ব্রহ্মদেশ যেখানে আছে সেইখানেই থাকুক——পর্ব্বত যদি মহম্মদের কাছে এসে হাজির হয়, তাহ'লে মহম্মদ কেনই বা পর্ব্বতের কাছে গমন করবেন? হপ্তা-দুয়ের পরেই "Versity Troup" নামে ব্রহ্মদেশের যে বিখ্যাত নৃত্য-সম্প্রদায়টি কলকাতায় এসে আসর জমাবে, তার মধ্যে আছেন ওখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নর্ত্তক ও নর্ত্তকী দল। খবর পেলুম, ওদের দেহ এমন নমনীয় যে তাদের মধ্যে হাড় আছে ব'লে সন্দেহই হয় না। ওদের পোষাকগুলি প্রাচ্যসুলভ লতাপাতাফুলে এমনি রঙিন যে, চোখের সামনে খেলা করে যেন প্রজাপতির স্বপ্নভুবন! ওদের নাচের মাঝে মাঝে নাচিয়েদের বিশ্রাম দেবার জন্যে থাকে ছোট ছোট কৌতুকাভিনয়। এবং ওদের নৃত্যের সঙ্গে তালে তালে বাজে যে-সব বাদ্যযন্ত্র, এখানকার বাঙালীর কাণ তাও কোনদিন শোনে নি।

*

এই দলের প্রধানা নর্ত্তকীর নাম মিয়া-তান্-চী। সে রূপসী। এবং তার বয়স যখন আঠারো, তখন তাকে তরুণীও বলতে পারি। ব্রহ্মদেশের স্কুল-কলেজের ছেলেদের উপরে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি যথেষ্ট। ব্রহ্মদেশের একাধিক লাট-সাহেব মিয়া-তান্ চীকে প্রশংসাপত্র বা স্বর্ণপদক দিয়ে তার অতুলনীয় প্রতিভাকে স্বীকার করেছেন। মিয়া-তান-চীর জীবনেও কিঞ্চিৎ অসাধারণতা আছে, বিশেষজ্ঞের লিখিত নীচের কাহিনীতেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

*

"ওর মা নাচতে জানত। ছোট বেলায় তাই দেখে ও নাচতে শিখেছে। একদিন জঙ্গল থেকে একদল জঙ্গ্‌লী বর্ম্মী ওদের গাঁ আক্রমণ করে। অনেক বাড়ী-ঘর লুট করে। মিয়া-তান্-চী ও তার মাকে ধ'রে নিয়ে যায়। মিয়া-তান-চী তখনই চমৎকার নাচতে জান্‌ত। বনের ভিতরে ডাকাতের আড্ডায় গিয়েও সে এমন অপূর্ব্ব নাচ দেখায় যে ডাকাতেরা একেবারে মোহিত হয়ে যায়। তারপর চতুরা মিঞা-তান্-চী আব্দার ক'রে সহর দেখতে চায় মার সঙ্গে। ডাকাতদের দলের একজন জঙ্গ্‌লী বর্ম্মী ওদের সহরে নিয়ে আসে। সহরে এসে মিঞা-তান্-চী খুব চেঁচাতে ও কাঁদতে সুরু করে। পথে লোক জমে, পুলিশ আসে। জঙ্গ্‌লী পালায়। নাচের মাহাত্ম্য বুঝে ওরা সেই থেকে নর্ত্তকীর পেশা অবলম্বন ক'রে সারা ব্রহ্মদেশে বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। ডাকাতদের পাথর-প্রাণেও যে নাচ দয়ার দরিয়া ছুটিয়ে দিতে পেরেছে, সে-নাচ যে বাংলার রসিক-সমাজে আনন্দ-চঞ্চলতার সৃষ্টি করবে এ-কথা বলা বাহুল্য মাত্র।"

*

নিজস্ব প্রতিনিধি লিখছেন :

গত শনিবার (১৭ই চৈত্র) বরাহ নগরের নব-প্রতিষ্ঠিত "খেয়ালী সংসদের" সভ্যেরা চৈত্র-পূর্ণিমা উৎসব করেছিলেন। উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল—নাটকাভিনয়। নাচঘরের সুপরিচিত লেখক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের "বামুনের মেয়ে" উপন্যাসটিকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে নাটকাকারে গ্রথিত করেছিলেন এবং দক্ষতার সঙ্গে সেই নাটকের অভিনয়-ও করেছিলেন। "খেয়ালী সংসদের" ছেলেরা অমরেন্দ্রবাবুর সেই নাটকখানিকেই পাদ-প্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত করেছিলেন। সাধারণ থিয়েটারের বহুবার অভিনীত মামুলী নাটক বর্জ্জন ক'রে তাঁরা যে এমন একখানি বই নির্ব্বাচন করেছিলেন, তাতে উক্ত

সংসদের সভ্যবৃন্দের রসবোধের পরিচয় পেয়ে তৃপ্ত হয়েছি। "বামুনের মেয়ের" অভিনয়-ও হয়েছিল—সুন্দর। প্রত্যেকেই তাঁদের ভূমিকাগুলির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র মজুমদার দুরাত্মা জমিদার গোলোক চাটুয্যের টাইপটিকে যথার্থ রূপে সঞ্জীবিত করেছিলেন। শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ মল্লিকের "প্রিয় ডাক্তার-"ও বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। শ্রীযুক্ত কেশব দে "অরুণের" অন্তর্নিহিত বেদনার সুর-কে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন ব'লে তাঁর অভিনয় হয়েছিল সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। "খেয়ালী"-বেশী খগেনবাবুর গানগুলি শ্রুতিসুখকর হয়েছিল। কিন্তু অভিনেতৃদের মধ্যে সব-চেয়ে যিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত দাস। শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত "সন্ধ্যার" ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ-ভূমিকায় তিনি নতুন অভিনয় করছেন না। "বামুনের মেয়ের" নাট্যরূপদাতা অমরেন্দ্রবাবু "সবুজ সঙ্ঘের" তরফে যখন উক্ত নাটকের অভিনয় করেছিলেন, তখন "সন্ধ্যার" ভূমিকায় লক্ষ্মীকান্তের অভিনয় দেখে আমরা শুধু তৃপ্ত হইনি, বিস্মিতও হয়েছিলাম। সে-অভিনয় দেখে নাট্যসমালোচক চন্দ্রশেখর লিখেছিলেন——…"তিনি এই চরিত্রের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য ও দৃঢ়তাটুকু যেমন ধরতে পেরেছেন, তেমনি প্রশংসনীয় সংযমের সঙ্গেই তা ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ধরণের ভূমিকায় একটু সংযমের হানি হ'লেই সমস্ত ব্যাপারটা কী বিশ্রী হয়ে উঠ্‌তো, সাধারণ রঙ্গালয়ে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পেয়েছি বলেই সন্ধ্যার অভিব্যক্তি আমাদের অত্যন্ত আরাম দিয়েছে…।"

আশা করি ভবিষ্যতে খেয়ালী-সংসদের অভিনয়ে সভ্যদের অভিনয় দক্ষতার নিপুণতর পরিচয় লাভ করব।"

*

দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে অভিনয়

"পঙ্কপ্রদীপ সম্মিলনীর উদ্যোগে বিহার দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থে আগামী ১৫ই এপ্রিল রবিবার ইউনিভারসিটি ইনিসটিউট মঞ্চে একটি মনোরম জলসা ও শ্রীশচন্দ্র বসু, বার, এট্, লর "সন্দিগ্ধা" অভিনয় আয়োজন করিয়াছেন। অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র, ভীষ্মদেব, অশোক ঘোষ, হীরেণ বসু, কার্ত্তিক দে, নগেন দে ও খগেন দে প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পিগণ এই আয়োজনে যোগদান করিয়া সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। সন্দিগ্ধার সাধারণ সমক্ষে অভিনয় এই প্রথম এবং পঙ্কপ্রদীপের সভ্যগণ সর্ব্বপ্রকারে অভিনয়ের গৌরব রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। নিম্নলিখিত সুধীবৃন্দ সাহায্য ভাণ্ডারের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন—শ্রীযুক্ত রাজকুমার বসু (সলিসিটর), ইন্দ্রভূষণ মিল্, কবিরাজ সত্যব্রত সেন, যতীন্দ্র নাথ বিশ্বাস, নটবর চন্দ্র দত্ত, বিজয় কুমার নাহার, যতীন্দ্র নাথ বসু, বি, এল। সর্ব্বসাধারণের আর্ত্তের সেবাকল্পে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

আজ বসন্তে জাগ্ল কারা!
জাগ্ল কোকিল, জাগ্ল চাঁপা, জাগ্ল সাঁঝের ধ্রুবতারা।

*

বাজ্লে বেণু গাইবি যদি নদীর ধারে আয়,—
ঐ-যেখানে চন্দ্রহারের মুক্তা ঝ'রে যায়,
ঐ-যেখানে জল-নূপুরে কলধ্বনি হেসেই সারা।

*

বকুল-তলায় নাচবি যদি শোন্ ওরে!
আমার প্রেমের সুর ভ'রে নে পায়জোরে!

*

মনের কথা শুনবি যদি মোহন হাওয়াতে,
প্রাণ-গোলাপের রং ভ'রে নে চোখের চাওয়াতে!
পেলে অধর-পরশ-মানিক ঝরবে সুখী আঁখির ধারা!

চিত্রপুরী : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় : এক্সকিউজ মি স্যার (নিউ থিয়েটার্স)

প্রধান ভূমিকায়—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

সিনেরিও ও পরিচালনা—ধীরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গত শুক্রবার থেকে চিত্রায় সুরু হয়েছে।

*

আমাদের দেশের ছায়াচিত্রাভিনেতাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত ধীরেন গঙ্গো র অভিজ্ঞতা যে সব-চাইতে বেশী দিনের, তাতে বোধ করি সন্দেহ নেই। যতদূর মনে পড়ছে, বর্ত্তমান চিত্রাভিনেতাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। তাছাড়া, কৌতুকাভিনয়ে যে তাঁর একটি সহজ স্বভাবসিদ্ধ ক্ষমতা আছে, এ-কথাও কেউ বোধ করি অস্বীকার করবেন না।

যে-ধরণের হাসির ছবি তিনি তুলছেন, সে-ধরণের ছবি আমরা চাই—তথাকথিত মনস্তত্ত্বের জগাখিচুড়ী, কিম্বা পৌরাণিক প্রে-কাহিনীর চেয়ে এই হাল্কা কমেডি অনেক সময়ে প্রচুরতরো আনন্দ দিতে সক্ষম হয়। ধীরেন বাবু ইতিপূর্ব্বে "মাস্তুত-ভাই" নামে যে-ছবিখানি তুলেছিলেন, সেখানি দেখে আমরা এই সব কথাই বলেছিলাম এবং সেই সঙ্গে বলেছিলাম যে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ধীরেনবাবুর শক্তি অধিকতর বিস্তার লাভ করবে। "মাপ করবেন মশাই"-এ আমাদের সেই কথাটি যাচাই ক'রে দেখবার সুযোগ এসেছে।

*

কিন্তু এ-সব ছবিকে নিক্তির ওজনে চুলচিরে সমালোচনা করবার প্রয়োজন নেই বোধ হয়। এর সমগ্র রূপটি ফলপ্রদ হয়েছে কিনা, তাই দিয়েই বিচার করা সব-দিক দিয়ে নিরাপদ। এবং সে'দিক থেকে বিচার করলে "এক্সকিউজ মি স্যার"-কে অনায়াসেই "মন্দ নয়" এর পর্য্যায়ে ফেলা চলে। মলিনার অভিনয়ের মধ্যে কুরুচির পরিচয় যদি আর একটু কম থাক্তো এবং ধীরেন বাবুর বাচন-ভঙ্গী যদি আর একটু কম পীড়াদায়ক হ'ত, তাহলে উক্ত ছবিখানিকে বাধাহীন প্রশংসায় অভিনন্দিত করতে পারতাম।

*

শ্রীযুক্ত ধীরেন গাঙ্গুলী মহাশয়ের অভিনয় ও বাচন-ভঙ্গী দেখে ও শুনে নিরতিশয় ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হয়েছি। তিনি অনেকদিনের অভিনেতা; কিন্তু তাঁর অভিনয়ের মধ্যে সেই "অনেক-দিনত্বে"র পাকা-চাল তো খুঁজেই পেলাম না, পরন্তু মনে হ'ল যেন তিনি একজন কাঁচা আনাড়ি অভিনেতাকে ব্যঙ্গ করছেন। তাঁর ভূমিকাটিকে আশানুরূপ appreciate করতে পারলাম না ব'লে, ভারী দুঃখিত বোধ করছি।

*

"এক্সকিউজ মি স্যার"-এর গঠন এবং Execution সুন্দর হয়েছে। 'যমপুরীর' সমগ্র Conceptionটি নূতনত্বের দীপ্তিতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। যমপুরীর দৃশ্যটি দেখে বুঝেছি, কৌতুকাভিনয় অনুষ্ঠানে ধীরেনবাবুর জোড়া নেই।

*

Four Frightened People—প্রখ্যাতনামা পরিচালক সিসিল বি ডি মিলির পরিচালনায় প্যারামাউন্টের নতুন ছবির নাম—আজ থেকে এলফিনষ্টোনে আরম্ভ হয়েছে।

ক্লডেট্ কলবেয়ার, হার্বার্ট্ মারশ্যাল; মেরি বোল্যাণ্ড ও উইলিয়াম কারগান—এই চারজনে মিলে "চার ভয়ার্ত্ত মানুষের" অন্তর্নিহিত আনন্দ-বেদনার কাহিনী ছবির পরদায় ফুটিয়ে তুলেছেন।

এক নিরীহ প্রকৃতির শিক্ষয়িত্রী সমাজ-সংস্কারের বাহিরে এসে কেমন করে তার আদিম বন্য প্রকৃতি ফিরে পেলে, এই ছবিতে নারী-চরিত্রের সেই দিকটি ক্লডেট্ কলবেয়ার অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।

*

ঋণমুক্তির একটি দৃশ্য

"রূপবাণীতে" কাল থেকে "ঋণমুক্তি" আরম্ভ হবে। ছবিখানিকে সকল দিক দিয়ে উপভোগ্য ক'রে তোলবার জন্যে সংগঠনকারীরা যত্নের ত্রুটি করেন নি! তাঁদের পরিশ্রম সফল হ'লে সুখী হব।

হলিউড্ গল্পিকা ঃ

অ্যাকাডেমি অব মোশান পিকচার্স আর্ট্‌স্ এণ্ড সায়ান্স্—ওদেশের একটি প্রতিপত্তিশালী অনুষ্ঠান। ছবি সম্বন্ধে তাঁদের বিচার ও মতামত সারা পৃথিবীতে বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে মেনে নেওয়া হয়। বছরের উৎকৃষ্টতম ছবি সম্বন্ধে বছরে বছরে তাঁরা যে রায় প্রদান করেন, সকলেই তা মানে। ১৯৩৩ স্যালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছবি সম্বন্ধে মতামত দেবার আগে তাঁরা কয়েকখানি ছবি বেছে নিয়েছেন। নিম্নলিখিত ছবিগুলির ভিতর থেকেই শেষ-নির্ব্বাচন হবে—

The Private Life of Henry VIII; Cavalcade; 42nd Street; I am a fugitive from a Chain Gang; Lady for a day; She done him wrong; Smiling Thru'; State Fair; Farewell to Arms।

*

শিশু-অভিনেতা বেবি লি রয়-কে নিশ্চয়ই দেখেছেন? Bed time story ছবিতে ছেলেটি মরিস শিভ্যালিয়রকে নাকের-জলে চোখের-জলে করেছিল। বছর দেড়েক বয়েস। কিন্তু ভারী ওস্তাদ। এই শিশু-তারকার আয় কত জানেন? মাসিক দুহাজার টাকার কম নয়—তবুও ন' মাস সে কোন ছবিতে নামে নি। তার নামে অনেকগুলি বীমা আছে। একটিতে তার কলেজের পড়াশুনা চ'লবে। আর একটি পলিসিতে সে যখন গ্রাজুয়েট হবে তখন দশহাজার টাকা পাবে। তার গরু-বাছুর চরবার যে জমিদারী আছে, তার আয়তনও বড় কম নয়। ছেলে তো নয়, পৃথিবীর বুকে ভগবান যেন ভুল ক'রে এক টুকরো আশীর্ব্বাদ ছুঁড়ে দিয়েছেন!

*

রেডিও পিকচার্সের মনোহারিণী অভিনেত্রী ডোলোরেস ডেল রিও যে নতুন ছবি তুলবেন, তার নাম হচ্ছে—Green Mansions!

জিমি ডুরাণ্টের নতুন ছবির নাম Strictly Dynamite। প্রযোজকদের মতে এইখানিই হবে জিমির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবি।

রেডিও পিকচার্সের কর্ত্তারা বার্ণাড শ'র নাটক Devils Disciple-এ নায়কের ভূমিকায় জন ব্যারিমুরকে নির্দ্ধারিত করেছেন। তাঁর সঙ্গে চুক্তির কথাবার্ত্তা চলছে।

*

"চাঁদ সদাগর" ক্রাউন সিনেমায় দিন দিন অধিকতর আকর্ষণের বস্তু হ'য়ে উঠেছে। আনন্দের কথা সন্দেহ নেই। ছবিখানির পিছনে বহু পরিশ্রম এবং বহু অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

*

"ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের" দ্বিতীয় বাঙ্লা ছবি হবে —"কারাগার"। মন্মথ রায় প্রণীত এই নাটকটির মধ্যে প্রচুর গতি-বহুল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত আছে এবং তার আখ্যান বস্তুও সবিশেষ হৃদয়গ্রাহী। তবে এ-কথা ঠিক যে, সেই action ও আখ্যান-কে যথাযথ ভাবে ছবির পরদায় রূপান্তরিত করা যথেষ্ট কঠিন কাজ। "চাঁদ সদাগরের" সিনেরিও রচনা আমাদের ভালো লেগেছিল; আশা করছি, এবারেও মন্মথবাবুকে দিয়েই তাঁর নাটকের সিনেরিও লেখানো হবে। লোক-পরম্পরায় শুনলাম, শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী "কারাগারের" পরিচালনা ক'রবেন এবং যাতে তাঁর কাজ ভালো হয় সেজন্যে তিনি অপর্য্যাপ্ত ভাবে পড়াশোনায় রত আছেন। আমাদের দেশের পক্ষে (যেখানে না প'ড়েই সবাই পণ্ডিত-) কথাটা নতুন শোনালো বটে।

*

আমাদের পাঠকবর্গ শুনে সুখী হবেন যে **শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের** একখানি উপন্যাস শা... কালী ফিল্মসের উদ্যোগে ছায়াছবিতে রূপান্তরিত হবে। এ বিষয়ে অন্যান্য সংবাদ যথাসময়ে পত্রস্থ হবে।

*

দেবকী বাবু নিউ থিয়েটার্সে ফিরে এসেছেন। আনন্দের কথা। উর্দ্দু ছবির কাজ শেষ ক'রে তিনি যেদিন নতুন কোন বাঙ্লা ছবি আরম্ভ করবেন, সেদিন আরও আনন্দিত বোধ করব। আমাদের ছায়াচিত্র-জগতের মহা মহা ধুরন্ধর পরিচালকদের মধ্যে, শুনেছি দেবকী বাবু পড়া-শোনার দ্বারা নিজের সাধনাকে পুষ্ট ক'রে তুলেছেন; এবং তার সে পরিচয় তাঁর কাজের মধ্যে একাধিকবার পেয়েছি।

*

পায়োনিয়র ফিল্ম কোম্পানীর সংবাদ কি? কবি কাজী নজরুল ইসলামের? শুনেছিলাম, তিনি পায়োনিয়ারের পরিচালকের পদ পেয়েছেন। তারপর আর কোন খবর পাই নি। হয়ত গোপনেগোপনে ছবি উঠ্ছে!

*

কালী ফিল্মস্-এর গাঙ্গুলী মহাশয় বর্ত্তমানে "অন্নপূর্ণার মন্দিরের" ভূমিকা নিয়ে ব্যস্ত আছেন। যোগেশ চৌধুরী মহাশয় এর সিনেরিও লিখেছেন। যাতে-ক'রে "অন্নপূর্ণার মন্দির"-কে দেশী ছবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবিতে পরিণত করা যায়, তার জন্যে প্রিয়বাবু কোন চেষ্টার ত্রুটি করছেন না।

আমাদের দেশের মহিলা-ঔপন্যাসিকদের যত বই পড়েছি, তাদের মধ্যে বিনা দ্বিধায় বলতে পারি, "অন্নপূর্ণার মন্দির" অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। এর মধ্যে কতকগুলি পুরনো পচা Stock character-এর আমদানী নেই, নেই তেমনিতরো কতকগুলো জোর-ক'রে-কাঁদাবার চেষ্টায় কণ্টকিত Stock situation! নর-নারীর তাজা বলিষ্ঠ মনের সংঘাত এবং বেদনার মধ্য দিয়েই এর আখ্যানবস্তু গ'ড়ে উঠেছে।

ধর্ম্ম, এবং পুরাণের মোহ কাটিয়ে প্রিয়বাবু যে এমন একটি খাঁটি জিনিষ বেছে নিয়েছেন তা দেখে বিশেষ খুশী হয়েছি।

*

"নিউথিয়েটার্সে"র "রূপলেখা"র কাজ শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার কর্ত্তৃপক্ষ এই ছবিখানিকে নিখুঁৎ ক'রে তোলবার জন্যে দীর্ঘকালব্যাপী যে যত্ন পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করেছেন, তাতে ওর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা অনেক আশাই পোষণ করি। "নিউ থিয়েটার্সে"র যতগুলি ছবি আজ পর্য্যন্ত বাজারে বেরিয়েছে, তাদের মধ্যে সমালোচকের দৃষ্টি অল্পবিস্তর দোষ ত্রুটি যে আবিষ্কার করতে পারেনি, তা নয়; কিন্তু সেই সঙ্গে

এ-সত্বেও অবশ্যস্বীকার্য্য যে, বাংলার অন্যান্য চিত্র প্রতিষ্ঠানের ছবির চেয়ে এখানকার চিত্রাবলী নানাবিষয়ে অধিকতর উন্নত ও সমগ্র হবার সুযোগ পায়। এখানকার কোন বড় ছবিই কারুকে একেবারে হতাশ করে নি, অন্য-অনেকের ছবি দেখতে গিয়ে যে দুঃখ আমাদের প্রায়ই ভোগ করতে হয়েছে। 'রূপলেখা'র ভূমিকা-লিপিও যতদূর সম্ভব লোভনীয় হয়েছে:—স্বলেখা—শ্রীমতী উমাশশী। অরুণ—কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া। উসিনর—শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ভাদুড়ী। মহেশ্বর—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। অশোক—শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী।……এর পরিচালক—কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া, সঙ্গীত-পরিচালক—শ্রীযুক্ত রাইচাঁদ বড়াল, সহকারী সঙ্গীত-পরিচালক—শ্রীযুক্ত পঙ্কজ মল্লিক, চিত্রশিল্পী—ইউসুফ মুলজী এবং শব্দযন্ত্রী—শ্রীযুক্ত লোকেন বসু ও শ্রীযুক্ত বাণী দত্ত।

*

"ভারতলক্ষ্মী"র কোন শিল্পী আমাদের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন যে, **"চাঁদসদাগরে"র** আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের জন্যে "নাচঘর" যে সুখ্যাতি করেছেন, তা শ্রীযুক্ত নিতাই মতিলালের প্রাপ্য নয়। এজন্যে প্রশংসার দাবি করতে পারেন শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ বাবু, শ্রীযুক্ত গোপাল লাহিড়ী ও শ্রীযুক্ত রঞ্জিত রায়। এই ভ্রমের জন্যে আমরা দুঃখিত।

*

ফিলিসোনর নামে যে নতুন টকি-যন্ত্রপাতির আমদানী হয়েছে এবং যার সম্বন্ধে আমাদের পত্রিকায় গত সপ্তাহে বিশদ বিজ্ঞাপন বার হয়েছে সেই নতুন যন্ত্র ব্যবহারকদের বিশেষ সন্তোষ অর্জ্জন করেছে। সিনেমা-প্রদর্শকগণ এই নতুন টকি-যন্ত্রটি ব্যবহার কোরে আশানুরূপ সুফল লাভ করেছেন এবং অতি অল্পদিনের মধ্যেই "ফিলিসোনর" বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে।

কলকাতার দুটী চিত্রগৃহে এই নতুন যন্ত্র লাগানো হয়েছে এবং উভয় চিত্রগৃহের কর্তৃপক্ষই তার গুণে সন্তুষ্ট হয়েছেন। "ছায়া" ও "ভারত লক্ষ্মী পিকচার হাউস"—এই দুটী সিনেমাগৃহে 'ফিলিসোনর" দর্শকদের শ্রবণ-বিনোদনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আশা করা যায় যাঁরা চিত্রগৃহ নির্ম্মাণ করবেন, তাঁরা "ফিলিসোনর" টকি-যন্ত্রটিকে অন্ততঃ একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।

ঢাকাই নাট্যজগৎ

(সংবাদদাতা—শ্রীতারকনাথ দাস)

১। ন্যাসানাল মেডিকেল ইন্‌স্টিটিউটে "মন্দির প্রবেশ"

গত ১৭ই মার্চ্চ ছাত্রদের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে ঢাকা ন্যাশানাল মেডিকেল ইন্‌স্টিটিউটে ঢাকার দায়রা ও সেসন জজ মিঃ এ, এন, সেন ও তাঁহার পত্নী ঐ সভায় ছাত্রদের পারিতোষিক বিতরণের ভার গ্রহণ করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্ররা ১৭ই ও ১৮ই শ্রীযুক্ত জলধর চট্টোপাধ্যায়ের "মন্দির প্রবেশ" অভিনয় করেন। বইটী যে খুব সময়োপযোগী, সে বিষয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। এই বইটী যিনি মনোনীত করেছেন তাঁকে প্রথমেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এর রূপ দেখা হয়েছে।

অভিনয়ের পূর্ব্বে দুইটী ছেলে ঢাকের তালে তালে আরতী নৃত্য করেন। আমরা এই নৃত্যের খুব সুখ্যাতি করতে পারলেম না। এর পর একটী ছেলে (খুব সম্ভবতঃ ধ'রে আনা হয়েছে) রবীন্দ্রনাথের "এসো নব-ধারা জলে" গানটী গাহিয়া নৃত্য করেন। এরূপভাবে যাকে-তাকে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের অবমাননা আমরা মোটেই পছন্দ করি না। এর চেয়ে না দেওয়াই ভাল ছিল। গানের সঙ্গে কার্য্যের মোটেই মিল ছিল না। তারপর অভিনয় আরম্ভ হোল। নৃত্য দেখে আমরা মুষড়ে পরেছিলাম, কিন্তু অভিনয় দেখে যথেষ্ট আনন্দ নিয়ে ঘরে ফিরে এসেছি, যদিও দু'একজনের অভিনয় ভাল হয় নাই। তা অবিশ্যি পুরুষ দ্বারা অভিনীত স্ত্রী চরিত্রগুলি। খুব কম পুরুষই আছেন যিনি স্ত্রী-চরিত্র সুষ্ঠুভাবে অভিনয় করতে পারেন। একটা না একটা গলদ থেকে যায়ই। তা এখানেও পুরোমাত্রায় ছিল। রসিকের ভূমিকা যিনি গ্রহণ করেছেন তাঁকে অন্তরের সহিত প্রশংসা জ্ঞাপন করছি। এ-ভিন্ন সোমনাথ, পুরোহিত, লোকনাথ রায় ও রামকানাইয়ের অভিনয় আমাদের ভাল লেগেছে। রামকানাইয়ের নৃত্যও বেশ মনোরম হয়েছে। লোকনাথ রায়ের গান মন্দ হয়-নি। দৃশ্যপটাদি নিন্দনীয় নয়। দুটী সেট্ সিন ছিল—তার ভেতর একটী বেশ ভালো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে "চিত্রাঙ্গদা"

গত ১১ই মার্চ্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদার" রূপ দেন। এই অভিনয়ের বিক্রীত অর্থ ভূমিকম্পের দুঃস্থদের সাহায্য করবার জন্য প্রেরিত হয়েছে। এই অভিনয়ে অভিনয়-শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন ঔপন্যাসিক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক ঘড়ির ৬টায় কাঁটায় কাঁটায় যবনিকা উত্থিত হয়। যবনিকা উত্থিত হইবার পর রবীন্দ্র-নাথের "সুধীজন স্বাগতম্" সঙ্গীতটী একজন ছাত্রী দ্বারা গীত হয়। তারপর শ্রীমতী ধনা গুহ-ঠাকুরতা "নৃত্যেরি তালে তালে হে নটরাজ" সঙ্গীতটী গাহিয়া একক নৃত্য করেন। তাঁর নৃত্য আমাদের পূর্ব্বের ন্যায়ই আনন্দ দান করেছিল।

ঐক্যতান বাদনের পর রবীন্দ্রনাথের "চিত্রাঙ্গদা" অভিনয় আরম্ভ হয়। অভিনয় দেখে মনে হ'ল যেন পুস্তকের অনেক যায়গায় কাঁচি চালানো হয়েছে। কুমারী পারুল সেনের "চিত্রাঙ্গদা" অভিনয় তত ভালো হয়নি। কিন্তু পরে এই ভূমিকায় কুমারী বাসন্তী সেনের অভিনয় মোটের উপর মন্দ হয়নি। অর্জ্জুনের ভূমিকায় কুমারী চিত্রা চ্যাটার্জ্জির অভিনয়ও বিশেষ ভালো বলা চলে না। বসন্তের ভূমিকায় কুমারী কমলা গুপ্তার অভিনয় অচল। মদনের

ভূমিকায় কুমারী গৌরী সেন আমাদের মনে বেশ ছাপ রেখে গেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিনয় আমরা ঢের ভালো হবে ব'লে আশা করেছিলাম। সে অনুযায়ী অভিনয় হয়নি।

দৃশ্যপট নেহাৎ মন্দ নয়। দুটী সেট্ সিনও ছিল।

আনন্দ পরিষদের "নিবেদিতা"

১৯শে মার্চ্চ আনন্দ-পরিষদ শ্রীযুক্ত জ্যোতি বাচস্পতির "নিবেদিতা" অভিনয় করেন। নিবেদিতা একটী মনস্তত্ত্বমূলক নাটক। এত নাটক বাজারে থাকতেও যে এঁরা এটা নির্ব্বাচিত করেছেন তার জন্যে এঁদের খুব সাহস আছে বলতে হবে। এই বইটা প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে রাধিকানন্দ-সম্প্রদায় কর্ত্তৃক অভিনীত হয়েছিল। বইটার ওপর নির্ম্মম ভাবে কাঁচি চালান হয়েছে। প্রোগ্রামে ছাপা থাকা সত্ত্বেও কয়েকটা চরিত্র ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। বিশেষতঃ "কোহিনুর" চরিত্রটা। এই চরিত্রটার সাথে রতিপতির চরিত্রটার অনেক যোগ ছিল—যাতে ক'রে তার চরিত্রটা বুঝবার পক্ষে অনেক অন্তরায় হয়েছে। বিশেষতঃ প্রথম অঙ্কের ২য় দৃশ্যে (যদিও তাঁরা এটাকেই প্রথম দৃশ্য করেছেন যে স্থানে প্রশান্ত প্রথম উপস্থিত থাকেন) যিনি নিবেদিতার অভিনয় করেছেন তার অনেকস্থলে মেয়েলী ভাব ফুটে ওঠেনি—বিশেষতঃ আধুনিক স্ত্রী-চরিত্রের ভাব। তার কথার ভেতর প্রাদেশিকতার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। রতিপতির ভূমিকায় শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বরের অভিনয় ভালো লেগেছে। তাঁর পূর্ব্ব সুনাম তিনি বজায় রেখেছেন। প্রশান্তকুমারের অভিনয়ে সুরেলা টান ছিল। বিজয়ের ভূমিকাও বেশ হয়েছে। বিশেষতঃ বাচন ও চালচলন। রামচরণ জ্যোতিষের ভূমিকায় পরেশবাবু অভিনয় এতটা স্বাভাবিক করতে পারবেন তা আমরা আশা করতে পারিনি। তাঁকে আমরা একজন ভাল বক্তা বলেই জানতুম, তাঁর ভেতর যে এতটা অভিনয়-শক্তি ছিল এটা আমাদের অজানা ছিল। ভবিষ্যতেও তাঁকে আমরা অভিনেতারূপে দেখতে ইচ্ছা করি। তাঁর প্রাদেশিক ভাষা বেশ লেগেছে। যিনি সুষমার অভিনয় করেছিলেন তাঁর চালচলন ও অভিনয় ভালোই হয়েছে বলতে হবে।

প্রতি দৃশ্যে সিন উঠতে বড়ই সময় লাগছিলো, ওটা বিরক্তিকর।

সাহিত্যের হাল-খাতা

(শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র)

আমাদের সাহিত্যের অবস্থা আজ কমা সেমিকোলন ছাড়িয়ে প্রায় ফুল্‌ষ্টপের কাছাকাছি এসে পৌচেছে। আজ সত্যি সত্যি এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে বইয়ের দোকানদাররা খুব বিখ্যাত সাহিত্যিকের লেখা ছাপাতেও ভয় পান এবং কোনও লেখকই সাহিত্যকে জীবিকা ব'লে গ্রহণ ক'রে নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না। একখানা উপন্যাসের জন্য প্রকাশকরা ৪০।৫০৲ টাকার বেশী দিতে চান না ব'লে সাহিত্যিকদের ক্ষোভের আর অন্ত নেই—কিন্তু সেই টাকাই যে প্রকাশকদের তিন-চার বছরেও উঠতে চায় না। প্রথম বছরে দুশো খানা আর তারপর দু'তিন বছরে আর দুশো খানা,—এই-ই নাকি ভাল বইয়ের সর্ব্বোচ্চ বিক্রী! তারপর নতুন বইয়ের ওপর shop soiled লিখে হকারদের টাকায় দু'পয়সা হিসেবে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই! এই ত সাহিত্যের বাজার-দর!

এর কারণ অবশ্য ব্যক্তিগত ক্রেতার অভাব। বাংলা বই কেনে লাইব্রেরী, তা বোধ হয় ভারতবর্ষে পাঁচ ছ'শোর বেশী নেই। তার মধ্যে অধিকাংশ লাইব্রেরীই বছরে একজন সাহিত্যিকের একখানা বা বড় জোর দুখানার বেশী বই কিনতে পারেন না, অথচ তাঁরা লিখে চলেছেন পাইকারী দরে। কাজেই যতগুলো লাইব্রেরী আছে ততগুলো বই বিক্রী হওয়াও সম্ভব নয়। অথচ ব্যক্তিগত ক্রেতা একেবারেই নেই।

বাজারের যা অবস্থা তা'তে ব্যক্তিগত ক্রেতা থাকা কঠিন। বাংলা বই তেরো ফর্ম্মা হ'লেই দু'টাকা দাম হয়, কিন্তু তেরো ফর্ম্মার একখানা ইংরেজী বই স্বচ্ছন্দে ছ'আনা বা পাঁচ আনায় পাওয়া যায়। দশফর্ম্মার বই, আমি হিসেব করে দেখেছি, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই এবং লেখকদের পারিশ্রমিক (প্রকাশকরা বর্ত্তমানে যে পরিমাণ টাকা দেন) সব দিয়েও স্বচ্ছন্দে ছয় আনা দামে বিক্রী করা যায়। যদি অবশ্য যথেষ্ট বিক্রী হয়। কিন্তু কোনও প্রকাশক যদি ভালো সাহিত্যিকদেরই বই ছ'আনা বা পাঁচ আনা দাম ক'রে ভাল ক'রে push করার চেষ্টা করেন তাহ'লে নিশ্চয়ই লাভ থাকার মত বেশী বিক্রী হ'বে।

তা ছাড়া বাংলা সাহিত্যে বর্ত্তমানে কিনে ঘরে রাখার মত ক'খানা বই বাজারে বেরোচ্ছে? বড় সাহিত্যিক ব্যাঙের ছাতার মত জন্মান না, কিন্তু মাঝারি সাহিত্যিক এক সঙ্গে একাধিক দেখা দিতে পারেন এবং তাঁদেরই সাহায্যে সাহিত্য থাকে বেঁচে। আমাদের দেশে কিন্তু মাঝারি সাহিত্যিকও তাড়াতাড়ি দেখা দেন না। ফলে সাহিত্য হয়ে ওঠে একটা অখণ্ড একঘেয়েমির ইতিহাস।

বঙ্কিম-যুগ এবং রবীন্দ্র-যুগের মধ্যেও সাহিত্যের এমনি দশাই হয়েছিল, কিন্তু রবি যখন মধ্যগগনে তখন একদল তরুণ সাহিত্যিক দেখা দিয়ে সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, সাহিত্যে বৈচিত্র আনেন। তার মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ, মণিলাল, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, কালিদাস, করুণানিধান, কিরণধন, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, প্রভাতকুমার, চারুচন্দ্র প্রভৃতি বহুদিন পর্য্যন্ত সাহিত্যকে প্রচুর জিনিষ দিয়েছেন, আজও কিছু কিছু দিচ্ছেন, ইতিমধ্যেই শরৎচন্দ্র দেখা দিয়েছিলেন। কিন্তু শরৎচন্দ্রের আলো যখন ম্লান হয়ে এল, প্রভাতবাবু, চারুবাবু প্রভৃতিও লেখা কমিয়ে দিলেন, হেমেন্দ্রকুমার নিলেন শিশুসাহিত্য ও কবিতালক্ষ্মীকে বরণ ক'রে। তখনকার দিনের বৈচিত্রহীন নীরস সাহিত্যের কথা মনে হ'লে যেন শিউরে উঠতে হয়। সে যেন একটা দুঃস্বপ্নের মতো। কবিদের ভাণ্ডারও রিক্ত হয়ে এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ থাকায় সে অভাব আমরা বুঝতে পারিনি। কথা-সাহিত্যের দৈন্য যতটা মর্ম্মান্তিক হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে হয়েছে, এতটা মর্ম্মান্তিক আর কিছু হয় নি। (অবশ্য নাট্য-সাহিত্য ছাড়া, কিন্তু ওখানে নিত্য অভাব তাই গায়ে সয়ে গেছে)।

ইতিমধ্যে নবীনদের আবির্ভাব হোল। এঁদের আবির্ভাবে আমরা আশান্বিত হয়ে উঠেছিলুম। কিন্তু এঁদের প্রতিভা সীমাবদ্ধ এবং তার শেষ সীমায় এঁরা ইতিমধ্যেই পৌচেছেন। তবুও এঁরা আর নতুন কিছু দিতে পারুন না পারুন, বা এঁদের দান সাহিত্যে অমর হয়ে থাক বা না থাক—এঁরা যে নিদারুণ Monotonyর মধ্যে বৈচিত্র এনেছিলেন তার জন্যেও ধন্যবাদার্হ।

কিন্তু পূর্ব্বেই বলেছি, এঁদের প্রদীপে তেল ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে এসেছে, বুদ্ধদেববাবুর 'এরা আর ওরা' কিম্বা অন্নদাশঙ্করের 'পথে-প্রবাসে'র পর ওর চেয়ে ভালো কিছু বা ওর সমান কিছু ওঁদের কলমে আর বেরোল না! (কিন্তু এঁদের কাল তো এখনো ফুরায় নি! আমি বলি এঁরা এখনো •ফুটছেন। সুতরাং এতটা হতাশ হবার দরকার নেই।

ইতি নাচঘর-সম্পাদক)

উপায় কি? সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনা প্রয়োজন কিন্তু সে বৈচিত্র্য আসবে কি ক'রে? তরুণদের আধা-ইংরাজী ভাষা বা ঐ ধরণের কাহিনী কিম্বা প্রবীণদের চর্ব্বিত-চর্ব্বণে আমাদের অতিরিক্ত রকমের অরুচি ধরেছে। কিম্বা কতকগুলি তথাকথিত ultraতরুণের প্রলাপও পয়সা খরচ করে কেনা যায় না। তবে?

হেমেন্দ্রবাবু (নাঃ সঃ) বোধ হয় এ-বিষয়ে প্রথম সচেতন হয়েছেন। রোমান্স-এর সঙ্গে এডভেঞ্চার মিশিয়ে তিনি ইতিমধ্যে খান-দুই তিন বই লিখেছেন। কিন্তু তিনি এ-বিষয়ে এখনও একা, এবং এমন প্রকাশকদের হাতে ঐ সব বই পড়েছে, যাঁরা বিশেষ ক'রে বিজ্ঞাপন করতে জানেন না। ও-সব বইয়ের বহুল প্রচার হয়নি। কিন্তু আমাদের মনে হয় এদিকে শক্তিশালী লেখকদের দৃষ্টি দেবার দিন এসেছে।

মামুলী প্রেমের গল্পের বিরুদ্ধে তরুণরা একদিন অভিযান করেছিলেন, কারণ একঘেয়ে কোনও জিনিষই ভাল লাগে না। কিন্তু প্রেমের গল্প বাদ দেওয়া কিছুতেই চলবে না, তবে নূতন ধরণে লেখা যায়। "বর্ত্তমান যুগের রোমান্স" বেশী দিন চলবে না, সনাতন রোম্যান্সেই ফিরে যেতে হ'বে, তবে তা বর্ত্তমান ধরণে বলা যেতে পারে। তাই বা কি, বিলেতে প্রিষ্টলে ডিকেন্স-এর style পুনঃ প্রচলিত ক'রে বিখ্যাত হয়েছেন, আমার মনে হয় আমাদের দেশেও বঙ্কিমী-রোমান্স revive করলে মন্দ লাগবে না।

বিলেতেও একদিন এমনি একঘেয়েমি সাহিত্যে এসেছিল। সেই সময়ে তাঁরা ডিটেকটীভ সাহিত্য প্রচলন করেন। যাঁদের সময় কম, অন্য বিষয় নিয়ে ভাবতেও হয় খুব বেশী, অথচ বিশ্রাম-সময়ে একটু-আধটু পড়তে চান, তাঁদের পক্ষে ডিটেকটীভ বই-ই সবচেয়ে ভালো। কিন্তু আমাদের দেশে হয় দীনেন্দ্রবাবুর চতুর্থ শ্রেণীর বিলিতী বই-এর তৃতীয় শ্রেণীর অনুবাদ, নয়ত দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলিতী বই-এর চতুর্থ শ্রেণীর বেমালুম 'ভাবগ্রহণ'—এ-ছাড়া আর কিছু নেই। কেন? ক্ষমতাশালী লেখক যাঁরা, তাঁরা চর্ব্বিত চর্ব্বণ ছেড়ে এদিকে আসুন না,—নিজস্ব কিছু সৃষ্টি করুন না!

সব চেয়ে বড় কথা দাম কমানো। একটু-আধটু কমানো নয়, রীতিমত দাম কমানোর প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। জনসাধারণ ইচ্ছে করলে ভালো সাহিত্যিকের বই যাতে দু'একখানা ঘরে রাখতে পারেন, এ ব্যবস্থা যতদিন না হ'চ্ছে ততদিন সাহিত্যিকের বা সাহিত্যের কল্যাণ নেই।

সঙ্কলন

ড্রামা

(শ্রীঅষ্টাবক্র)

পুনরাবৃত্তি

২

নাটক সম্বন্ধে ভাবলে সর্ব্বপ্রথম মনে হয় আমাদের দেশের ট্র্যাজাডির অভাব। আমি কালিদাস ভবভূতি থেকে আরম্ভ ক'রে ডি, এল রায়, রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ভাবি—ট্র্যাজাডির অস্তিত্ব পাই না।

কালিদাসের শকুন্তলা করুনরসে পরিপূর্ণ। সুন্দর এই রচনা। কিন্তু এর সৌন্দর্য্য কোমল। ট্র্যাজাডির প্রকৃত বিকাশ হয় অধিকাংশ পুরুষের চরিত্র নিয়ে। কারণ, ট্র্যাজাডির জন্য যে ভীষণ নিঃসঙ্গতার প্রয়োজন হয়, নারীর মধ্যে তা সম্ভব নয়। নারীর সব সময়েই একটা না একটা অবলম্বন থাকেই। শকুন্তলা দুষ্মন্তের বিস্মৃতির জন্য বিদগ্ধা, কিন্তু তবু তার কাছে রয়েছে তার শিশু—সান্ত্বনার প্রতীক্ রূপে। নারীর চরিত্রে বিদ্রোহের স্বাভাবিকতাও নেই; এবং এ বিদ্রোহের অভিব্যক্তিই হচ্ছে ট্র্যাজাডির একটা প্রধান অংশ। অন্ততঃ এই দুটি কারণে শকুন্তলায় ট্র্যাজাডির কোন চিহ্ন নেই। কালিদাসের emphas's দুষ্মন্তের উপর নয়, শকুন্তলার উপর। কলিদাসের প্রতিভা বিলক্ষণ। সেই পুরাতন যুগেও তিনি রচনা-বিধির যা পরিচয় দিয়েছেন তা বিস্ময়কর। কিন্তু জীবনে ট্র্যাজাডি দেখবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। শকুন্তলা ট্র্যাজাডির কাছেও যায় নি। কাছে গিয়েছে ভবভূতির উত্তররাম।

ভবভূতি সম্বন্ধে আমার মত একটু অদ্ভুত ব'লে মনে হবে। ভবভূতির রচনায়—উত্তররামচরিতে—ট্র্যাজাডির সব ভাবই বর্ত্তমান। এঁর emphasis সীতার উপর নয়, রামের উপর। রামের চরিত্র গভীর; তাঁর দুঃখ ব্যাপক এবং নির্ম্মল; তাঁর শক্তি প্রচুর। শকুন্তলার মতন তাঁর চরিত্র আমাদের মনে করুণার ভাব জাগায় না—(করুণার মধ্যে দয়ার ভাব রয়েছে) জাগায় শ্রদ্ধা। রাম শক্তিশালী; নিজের অপরিসীম দুঃখ বহন করবার ক্ষমতা তাঁর আছে। দুঃখের অনুভূতিতে তিনি একা, কিন্তু দুর্ব্বল ন'ন। তাৎপর্য্য এই যে, রাম এক মস্ত ট্র্যাজিক ক্যার‍্যাক্টর; তবু উত্তররাম ট্র্যাজাডি নয়। এই নাটকের শেষের দিকে ভবভূতি সাহিত্যের সংস্কার রক্ষা করবার জন্য দিলেন মিলন করিয়ে। লোক হয় ত খুসী হ'ল, কিন্তু ট্র্যাজাডি হ'ল নষ্ট। এই সুখান্তক শেষ করবার যে উদ্দেশ্য, তার বিষয়েই আমার অভিমত অদ্ভুত বলছিলাম।

আমাদের পুরাতন আধ্যাত্মিক স্পেশালিষ্টরা ট্র্যাজাডির বিরুদ্ধে কতগুলো নিয়মের সৃজন করেছিলেন, এ কথা আমি জানি। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। ভবভূতির প্রতিভা এমন প্রখর যে আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না যে, শুধু লোককে খুসী করবার জন্য, কিংবা সাহিত্যের তৎকালীন নিয়ম পালনের জন্য, তিনি সুখান্তক মিলন করিয়ে দিলেন। প্রতিভার একটা গুণ হচ্ছে এই যে, সে সৃষ্টির জন্য নিয়ম ভঙ্গ করে। ভবভূতি তা পারতেন; তাঁর ব্যক্তিত্ব (p·rsonality) যে খুব প্রবল তা তাঁর রচনায় দেখা যায়। ব্যক্তিত্ব প্রবল না হ'লে ট্র্যাজাডির যথার্থ অনুভূতি হওয়া কঠিন। তবে ভবভূতি এমন ক'রে তাঁর নাটকের শেষ করলেন কেন? আমার মতে, তিনি সাধারণ লোকরুচির প্রতি বিদ্রূপ করবার জন্যই সুখান্তক শেষ করলেন।

শেক্‌সপীয়রের As You Like It নামক ড্রামার আলোচনা করবার সময় বর্ণর্ড শ এই কথা বলেছেন: "When Shakespeare was forced to write popular plays to save his theatre from ruin, he did it mutinously calling the plays, "As You like it", "Much Ado About Nothing." আমার মনে হয়, উত্তররাম লিখবার সময় ভবভূতির মনে এই mutinyর ভাব বিদ্যমান ছিল। তিনি সাধারণ লোকের রুচিকে অবজ্ঞা ক'রেই, বিদ্রূপের জন্য, তাঁর নাটকের সুখান্তক শেষ ক'রে দিলেন। তিনি হয়ত এই রকম ভেবেছিলেন: "যদি এত বড় ট্র্যাজাডির মূল্য দু-এক কথায় তোমাদের জন্য নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, তোমরা যদি সামান্য একটা বাক্য কিংবা ঘটনার জন্য এই এত গভীর এবং ব্যাপক দুঃখ ভুলে যেতে পার—তা হ'লে আমার কোন আপত্তি নেই। আমি দিচ্ছি তোমাদের ভুলিয়ে। কিন্তু মনে রেখো যে, এই ভুলে যাওয়াই হচ্ছে তোমাদের শাস্তি।" সুতরাং যখন রাম কাতর হ'য়ে "হা দেবি! হা দেবি!" ক'রে চীৎকার করেন, তখন ভবভূতি অলক্ষিতে হাসেন এবং বলেন, "ঘাবড়ে যেয়ো না!

এই শোন লক্ষ্মণ কি বলছে।" লক্ষ্মণ মুরুব্বির মতন রামকে বুঝিয়ে দেন—"নাটকমিদং।"

এইটা যদি ঠিক হয় তা হ'লে ভবভূতি আজকালকার সুখান্তক শেষ লেখকদের গুরু কিংবা prototype ন'ন। তাঁর সুখান্তক শেষ সাধারণ লোকের জন্য এক blind; রসিকজন তাকে বাদ দিয়ে উত্তররামচরিতের ট্র্যাজিক গুণে মুগ্ধ।

সে যাই হ'ক, প্রাচীন সময়ে ট্র্যাজাডির বিকাশ না হওয়ার প্রধান কারণ ছিল আমাদের অন্ধ নীতির অত্যাচার। বড় একটা চরিত্র সমাজে জন্ম নিত না। সকলের আত্মা আজকালকার জিনিষের মতন mass production-এর নিয়মেই ফুটে উঠত। তারপর, যদি দু একজন বড় হতেন এবং তাঁদের জীবনে দেখা যেত এক গভীর দুঃখের প্রকাশ, তবে আমাদের নীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলতেন—"কর্ম্মফল! যদি এই জন্মের নয় ত পূর্ব্বজন্মের।" এই পেটেণ্ট থিওরিই ছিল আমাদের যা-কিছু। জগতের কোন রহস্যই আমাদের কাছে অজানা থাকত না; সবাই যেন সোজা। রহস্যবোধই হচ্ছে আর্টের প্রথম কথা। আর্টিষ্টের মনে যখন "কেন কেন, কেন"র প্রশ্ন জাগে তখন সে সমস্ত সৃষ্টির রহস্যের যোগ দেয়। সৃষ্টিতে এই প্রশ্নের চেয়ে বড় রহস্য আর নেই। আর্টিষ্ট অবশ্য এই প্রশ্নের উত্তর দেয় না। সে কেবল তার প্রতিধ্বনি করে তার রচনায়। আমাদের দেশে প্রাচীন সময়ে প্রথমতঃ কেউ কিছু জিজ্ঞেসই করত না। যদিই বা রহস্যবোধের প্রেরণায় দু একজন এই "কেন"র প্রতিধ্বনি করতেন তা হ'লে সহস্রাধিক বেদ-শাস্ত্র পুরাণ নরনারী চীৎকার ক'রে বলত, "ওহে মূঢ়! কেন এই প্রশ্ন! এ যে কর্ম্মফল—ভাগ্য!" এমন ক্ষেত্রে আর্টের সৃষ্টি বড় বেশী হয় না। আমাদের দেশেও হ'ল না।

কিন্তু আধুনিক যুগের এ অবস্থা নয়। এখন আমরা স্বাধীন। অন্ততঃ মনে। তবু আজকালকার দিনে একটাও ট্র্যাজাডি লেখা হয় নি কেন? আমাদের সাধনা কি এত বাহ্য? আমাদের রুচি কি এতই স্থূল? সমস্ত জাতির রুচির বিকাশ হয় একজনের প্রতিভায়। আজকালই যে দেশে গান্ধির মতন ট্র্যাজিক ক্যারাক্টারের জন্ম হয়, সেই দেশে রমা রলাঁর মতন ট্র্যাজাডির স্রষ্টার জন্ম হয় না কেন? আমি উত্তর দেব না; জানি না ব'লে। তবে আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি যে ডি, এল রায়ের একটাও নাটক ট্র্যাজাডি নয়; রবীন্দ্রনাথেরও নয়। আমি শাজাহাঁ পরপারে ইত্যাদি ভুলিনি; রক্তকরবীও আমার মনে আছে।

এইবার প্রশ্ন অনিবার্য্য—ট্র্যাজাডির বিশেষ গুণ কি?

৩

গ্রীকদের যুগে ট্র্যাজাডির রূপ এবং অর্থ বড়ই স্থূল ছিল। অরিষ্টটল তাঁর Poeticsএ লিখেছেন যে ট্র্যাজাডি হচ্ছে "an action that through pity and fear effects the proper purgation of these emotions." এই purgationএর জন্যই গ্রীক নাটককারের emphasis ছিল নীতির বিজয়ের উপর। অর্থাৎ একজন পাপীকে দুঃখ সহ্য করতেই হবে। তা ছাড়া ট্র্যাজাডির মূলে থাকত একজন বড়লোক। বড়লোকের অর্থ রাজা কিংবা যোদ্ধা; এবং actionএর অর্থ যুদ্ধ, মারামারি, হত্যা। সন্তাপের অনুভূতিই দুঃখের মূল—ট্র্যাজাডি। বলা বাহুল্য, গ্রীকদের সময়ে ট্র্যাজাডির প্রকাশ স্থূল ছিল এবং রচনাবিধি চমৎকার হ'লেও actionএর ভাবটা ছিল বড়ই প্রাথমিক।

রিনেসাঁর পর, মানুষের জিজ্ঞাসা-প্রবৃত্তি নব নব রূপে জাগ্রত হ'ল। লিয়ারের রচনায় শেকস্‌পীয়ার প্রমাণ ক'রে দিলেন যে, ট্র্যাজাডির জন্ত যুদ্ধ-হত্যা আবশ্যক নয়; তার বীজ মানুষের মনোভাবে নিহিত এবং সেইখানে তার বিকাশ। লিয়ারের সমস্ত ট্র্যাজাডিই মনোভাবের। এই মতাবলম্বে গেটে লিখলেন ফষ্ট।

অতি-আধুনিক যুগে এই সংস্কারের উৎকর্ষ দেখা যায়। শেকস্‌পীয়ারের পর য়ুরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রতিভাশালী লেখকরা বরাবরই আর্টের নানা ক্ষেত্রে ট্র্যাজাডির বিকাশ সূক্ষ্মরূপে করবার চেষ্টা করেছেন। এখন শুধু নাটকেই নয়, কথা-সাহিত্যেও এর পরিচয় পাওয়া যায়। আজকালকার সবচেয়ে বড় ট্র্যাজাডি রলাঁর জাঁ-ক্রিস্তাফ। এরই সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা আমি-বোঝাবার চেষ্টা করব ট্র্যাজাডির বিশেষ গুণ কি?

ক্রিস্তাফ একজন রাজা, বাহিরের নয়, মনের। তার হৃদয় যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র; সংসারের শত শত অসত্যের সঙ্গে তার যুদ্ধ। তার চিরবিদ্রোহী আত্মার কাছে সে নিজেই অপরিচিত। সে মহান্। তার বন্ধু নেই, বান্ধবী নেই। সে একা। জীবনের কত মুহূর্ত্তে কত প্রণয়; কত সুখ; কত ব্যথা। তার হৃদয়ের মাঝে বিরাটের সুর সব সময়েরই eternal passion, eternal painএর ভাব জাগায়। সে মরে অ.বার বাঁচে। একটা মৃত্যুর মধ্যে অপর জন্মের বীজ। তার জরা নেই; সে চিরকুমার। পাপের পঙ্ক দিয়ে যায়, তবু সে নিষ্পাপ। কেউ তাকে বোঝে না। কেউ তাকে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসে না; সে যে ভালবাসার বার। সে কাঁদে এবং হাসে। প্রতিদিনের জীবনেই সে নিজেকে খুঁজে নেয়; আবার হারিয়ে ফেলে। ভীষণ অশান্তিতে তার মস্তক ছিন্ন; শত শত ঘা তার বুকে। সে সমস্ত সংসারকে আপন ক'রে নিতে চায়; সংসার তাকে বোঝে না। শান্ত হ'য়ে আসে ক্রিস্তাফ। তার জীবনীশক্তির ভাণ্ডার রিক্ত। সে হেরে যায়, কিন্তু হেরে যাওয়াই তার একমাত্র বিজয়। তার মৃত্যু জন্মের প্রতীক। অনন্ত জীবনের ভৈরবস্তব।

এই সুন্দর রচনার ভিতর দিয়ে যে রস-ধারাটি প্রবাহিত তার নাম magnitude of suffering। এই হচ্ছে ট্র্যাজাডির আসল গুণ। এটা অনুভব করবার জিনিষ; ভাষায় ব্যক্ত করা যেতে পারে না। লিয়ারের মধ্যে এই গুণ আছে; হ্যামলেটের অথেলোর মধ্যেও। কিন্তু এরা সকলে বাইরের দিক দিয়ে বড়লোক। ক্রিস্তাফ বাইরের দিক দিয়ে নগণ্য। ট্র্যাজাডি অন্তরের।

আমাদের দেশে একটিও রচনা এমন নেই যাতে এই magnitude of suffering আছে। রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবীর রাজা এক অদ্ভুত সৃষ্টি; কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট। তা ছাড়া, তার দুঃখ বহুধা নয়; শত শত মৃত্যুর পথ দিয়ে তার যাত্রা হয় নি। তবে, রক্তকরবীর আলোচনা ট্র্যাজাডির standard নিয়ে করা যায় না। আমি এর সম্বন্ধে দু এক কথা লিখলাম এই জন্য যে অনেকে তাকে ট্র্যাজাডিই ভাবেন—সূক্ষ্ম প্রকারের। (ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচ-ঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷৹ টাকা

১০ম বর্ষ
১১শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৩০শে চৈত্র
১৩৪০

কলালাপ

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত বিহারের সাহায্যের জন্যে গেল হপ্তায় "The Tagore Dramatic Group" রবীন্দ্রনাথের "রক্ত-করবী"র অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। এই উপলক্ষে শিল্প ও সাহিত্যের আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ "রক্তকরবী" নামে যে চমৎকার লেখাটি লিখেছেন, তা রবীন্দ্রনাথের এই বিশেষ নাটকখানির অন্তর্গূঢ় রস উপভোগ করবার পক্ষে সাহায্য তো করবেই, উপরন্তু রচনাটির নিজস্ব সৌন্দর্য্যেরও অপূর্ব্বতায় সকলে মুগ্ধ হবেন ব'লেই বিশ্বাস করি। তাই লেখাটি আমরা "নাচঘরে"র পাঠকদের হাতে উপহার দিলুম। সেই সঙ্গে এই উপলক্ষেই রচিত ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিশ্বকবির একটি নূতন কবিতাও রসিকদের করকমলে অর্পণ করলুম।

প্রথমে, শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কলম যা বলছে, শুনুন :—

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নর্ত্তকী—
মিয়া-তান-চী

এই নাট্যব্যাপার চলেছে "যক্ষপুরীতে" যেখানে মাটির তলায় কবর দেওয়া থাকে যক্ষের ধন,—পাতালের কাছাকাছি একটা জায়গায়। যক্ষ-পুরের ভারবাহীর দল—মাটির তলাকার সোনা তোলার কাজে দিনরাত নিযুক্ত—খুঁড়ে তুলছে মাটি, কেটে চলেছে সুড়ঙ্গ, বহে আনছে কত কত সোনা তাল তাল অবিরাম। এখানকার "মালিক" যে, সে আছে অষ্টপ্রহর অসংখ্য মানুষের সুখদুঃখ থেকে দূরে, একটা অত্যন্ত জটিল জালের আবরণে ভীষণ তার অদৃশ্য শক্তি নিয়ে প্রচ্ছন্ন। প্রকৃতির বক্ষ থেকে, মানুষের প্রাণ থেকে শক্তি শোষণ করে নিয়ে স্ফীত হবার জাদু সে জানে,—তাই নিয়ে অমানুষিক নির্ম্মমতার নানা পরীক্ষায় সে নিযুক্ত। তার পরীক্ষাশালায় যে প্রবেশ করে সে বেরিয়ে আসে কঙ্কালসার হয়ে, তার অস্তিত্ব হয় ছায়ার মত নিঃস্বত্ব। বিরাট এই জালের তৈরি বেড়া এর বাহিরে খোদাইকরদের কাটা নানা কালো কালো খানাখন্দগুলোই ক্ষুধার্ত্ত দানবের কবলের মতো পড়ে দৃষ্টিপথে। এইখানে তপ্ত ফাল্গুনের প্রখর আলোয় কোনো এক প্রমত্ত বসন্তদিন ফুটিয়ে তুললে একটি "রক্তকরবী"। আনন্দহীন কর্ম্মের আবর্জ্জনার একধারে মূল্যহীন আনন্দের ইসারা জানালে সেই ফুল। 'বিশু পাগল" সে আগলভাঙা প্রাণ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় এই রক্ত করবীকে ঘিরে,—মরুভূমির খোলা বাতাস যেন সে! কর্ম্মের শেষে যক্ষপুরে ওঠে "চাঁদ", শান্ত তার দৃষ্টি - জাগায় নেশার অতৃপ্তি কারিগরদের মনে, মাতলামির অট্টহাস্যের ধ্বনি জাগে, অশান্ত রাত্রির পারে তলিয়ে যায় চাঁদ মাতালের হাতে ভাঙাচোরা একটা স্বর্ণ পাত্রের মতো।

প্রথম—

যক্ষপুরীর মানুষধরা ফাঁদে কখন্ ধরা পড়েছে নন্দিনী। ছিল সে

"রঞ্জনে"র কর্ম্মসখী, প্রেমের নন্দনবনে, এখানে এসেছে প্রাণগ্রাসী পাতালপুরীর হাঁ-করা গহ্বরের প্রদোষান্ধকারে। "রঞ্জনে"র বাঁশির ডাকের সুর আসে নন্দিনীর চোখে, তার হাসিতে, তার চলায় বলায় চঞ্চল হয়ে ওঠে যক্ষ-পুরীর বাহনের দল, তার কাছে ছুটে আসে "কিশোর", না-দেখা বনের রক্তকরবী ফুলের সন্ধান দেয় নন্দিনীকে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যাঘাত হয় অধ্যাপনায়, ওর কাছে কাছে ঘুরে বেড়ান "অধ্যাপক", ইনি শক্তিতত্ত্বের আলোচনা করেছেন অনেককাল, এখন নন্দিনীকে দেখে অবধি আনন্দ-রহস্যের সীমা পান না। তাঁর নিরঞ্জন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে রক্ত করবীর রঙের অঞ্জন লাগ্‌ল। রঞ্জনের বাঁশি ডাকে থেকে থেকে নন্দিনীকে কাজের ভিড়ের মধ্যেও। এই খবরটা জানে মালিক ;—আর সে এও জানে যে, যে সোনা সে পায় হাজার হাজার মানুষের প্রাণ দেউলে ক'রে, সেই সোনা দিয়ে সে আনন্দ পায় না কণামাত্র। তাই সে ঐশ্বর্য্যের পিঞ্জরে গর্জ্জাতে থাকে বন্ধ্যা সম্পদের নিস্ফলতায়। রঞ্জন আর নন্দিনীর মাঝে সে সৃষ্টি করতে চায় প্রচণ্ড বিচ্ছেদ। পিপাসার্ত্ত নীরস কণ্ঠের নিরানন্দ অট্টহাসি হাসে সে আপন জটিল জালের আড়ালে ব'সে—নন্দিনীর 'পরে তার নিগূঢ় টান নির্ম্মম ঈর্ষায় সাংঘাতিক হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়—

যক্ষপুরীতে ধ্বজাপূজার উৎসব লেগেছে—কর্ম্মক্লান্ত দিনের মাঝে একটু-খানি অবসর, যার অবসান হল বীভৎস উল্লাস আর নিদারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি কোস্তাকুস্তির প্রাণান্তকর দৃশ্যে!

তৃতীয়—

শক্তিদেবীর কাছে অসংখ্য বলির মধ্যে রঞ্জনও কখন্ প্রাণ হারালো। তখন আর সইল না, নন্দিনী উঠ্‌ল রুদ্রাণী হয়ে। জাল থেকে বেরোলো রাজা, অন্তহীন সংগ্রহের মোহ গেল তার ছুটে, বিদ্রোহ ঘোষণা করলে নিজেরই বিরুদ্ধে। মুক্তির প্রবল আবেগ, ধ্বংসের প্রচণ্ড ঝটিকা, নিরুদ্ধ শক্তির বিরাট ভূকম্পনের মধ্যে যক্ষপতির জয়যাত্রা সুরু হ'ল নন্দিনীর হাতে হাত রেখে, মৃত্যুর তোরণদ্বার উত্তীর্ণ হয়ে। ভেঙে পড়ল যক্ষপুরীর সেই ধ্বজদণ্ড যা পৃথিবীর মর্ম্মকেন্দ্র বিদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়েছিল। আকাশে ছিন্নভিন্ন একটা গন্ধর্ব্ব-নগরীর মতো মিলিয়ে গেল যক্ষপুরী হাওয়ায় হাওয়ায়। যে কবর থেকে উঠেছিল সেই পুরী, সেই কবরেই তলিয়ে গেল বিরাট মিথ্যা—ভাঙন আঁকড়ে দাঁড়িয়ে রইল একটিমাত্র রক্ত করবী গাছ, সবুজপাতার ছায়া শুক্‌নো মাটিতে মেলে দিয়ে।

*

অতঃপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যরসধারা :—

হায় ধরিত্রী, তোমার আঁধার পাতাল দেশে
অন্ধ রিপু লুকিয়ে ছিল ছদ্মবেশে
সোনার পুঞ্জ যেথায় রাখো,
আঁচলতলে যেথায় ঢাকো
কঠিন লৌহ, মৃত্যুদূতের চরণধূলির
পিণ্ড তা'রা, খেলা জোগায়
যমালয়ের ডাণ্ডাগুলির॥

উপর তলায় হাওয়ার দোলায় নবীন ধানে
ধনশ্রীসুর মূর্চ্ছনা দেয় সবুজ গানে।
দুঃখে সুখে স্নেহে প্রেমে
স্বর্গ আসে মর্ত্ত্যে নেমে,
ঋতুর ডালি ফুল-ফসলের অর্ঘ্য বিলায়,
ওড়্‌না রাঙে ধূপ-ছায়াতে
প্রাণনটিনীর নৃত্যলীলায়॥

অন্তরে তোর গুপ্ত যে পাপ রাখ্‌লি চেপে
তা'র ঢাকা আজ স্তরে স্তরে উঠ্‌ল কেঁপে।
যে বিশ্বাসের আশ্বাসখানি
ধ্রুব ব'লেই সবাই জানি
এক নিমেষে মিশিয়ে দিলি ধূলির সাথে,
প্রাণের দারুণ অবমানন
ঘটিয়ে দিলি জড়ের হাতে॥

বিপুল প্রতাপ থাক্‌না যতই বা'হির দিকে
কেবল সেটা স্পর্দ্ধাবলে রয়না টিকে।
দুর্ব্বলতা কুটিল হেসে
ফাটল ধরায় তলায় এসে
হঠাৎ কখন দিগ্‌ব্যাপিনী কীর্ত্তি যত
দর্পহারীর অট্টহাস্যে
যায় মিলিয়ে স্বপ্নমতো॥

হে ধরণী, এই ইতিহাস সহস্রবার
যুগে যুগে উদ্‌ঘাটিলে সামনে সবার।
জাগ্‌ল দম্ভ বিরাট্‌রূপে,
মজ্জায় তার চুপে চুপে
লাগ্‌ল রিপুর অলক্ষ্য বিষ সর্ব্বনাশা,
রূপকনাট্যে ব্যাখ্যা তা'রি
দিয়েছ আজ ভীষণ ভাষায়॥

যে যথার্থ শক্তি সে তো শান্তিময়ী,
সৌম্য তাহার কল্যাণরূপ বিশ্বজয়ী।
অশক্তি তার আসন পেতে
ছিল তোমার অন্তরেতে
সেই তো ভীষণ, নিষ্ঠুর তার বীভৎসতা,
নিজের মধ্যে প্রতিষ্ঠাহীন
তাই সে এমন হিংসারতা॥

*

শিশিরকুমার যে-'রাবণ'কে 'ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে ধ'রে এনে দেখাবেন, তিনি নাকি "তরণীসেন-বধে"র রাবণ।··· ··· ··· শুনে সুখী হলুম যে, শিশিরকুমার নব নব শক্তিশালী নট-নটী সংগ্রহ করে, আপন সম্প্রদায়কে অধিকতর বলিষ্ঠ ক'রে তোলবার চেষ্টায় আছেন।

*

বেতার নাটুকে দল নিয়মিত ভাবে নাটক অভিনয় করছেন। গ্রামোফোন কোম্পানিও আর একটি নাটুকে দল পুষছেন। বার্দ্ধক্য নট-নটীদের শিল্পীজীবনের পক্ষে মঙ্গলদায়ক নয় এবং অনেকের পক্ষে মারাত্মকও বটে। এবং প্রাচীনতার অভিশাপে দুঃখ ভুগতে হয় বিশেষ ক'রে নটীদেরই। কেবল বার্দ্ধক্যের জন্যে অনেক শিল্পীকেই বেকার হয়ে ব'সে থাকতে হয়, অথচ তাঁদের নাটনিপুণতা তখনো অক্ষত থাকে। কিন্তু বেতারের ও

গ্রামোফোনের নাটুকে সম্প্রদায়ে যে-সব নট-নটী কাজ করেন, তাঁদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় বয়সেও তাঁরা প্রায় সকল শ্রেণীর ভূমিকাই গ্রহণ করতে পারেন, কারণ শ্রোতাদের চোখের সামনে তাঁদের আত্মপ্রকাশ করতে হয় না। এই কারণে বেতারের ও গ্রামোফোন কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে বাংলার প্রাচীন ও বেকার অভিনেতৃগণের অনেক অভাবই মোচন করতে পারেন, অথচ এর ফলে তাঁদের নিজেদের সম্প্রদায়ের অধিকতর উন্নতিরই সম্ভাবনা। শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী প্রভৃতির মতন নট-নটীর কণ্ঠের সাহায্য পেলে বেতারের ও গ্রামোফোনের নাটুকে দলের মর্য্যাদা যে বাড়বে, এ-বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে কি? আমরা উপর-উক্ত দুই সম্প্রদায়ের কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি।

*

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত University Troupe নামে নৃত্য-সম্প্রদায়টি এপ্রিল মাসের শেষের দিকে কলকাতার এম্পায়ার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করবে। যত-বেশী অসুবিধা ও বাধা, শিল্পীর প্রাণ যে তার ভিতরেই তত-বেশী আনন্দলাভ করে এবং আর্ট যে অবলীলাক্রমে কঠিন সব বাধা ভেঙে নিজের অনাহত সৌন্দর্য্যকে প্রকাশ করতে পারে, ব্রহ্মদেশের এই নাচের সম্প্রদায়টির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলে সকলেই এ-সত্যটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন। তারপর, গেল হপ্তায় যে রূপসী তরুণী নর্ত্তকী **মিয়া-তান-চীর** কথা বলেছি, তাঁর নৃত্য-প্রতিভা যে সকলকেই মোহিত করবে, সে-বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। ব্রহ্মদেশে অনেক রকম নাচের চলন আছে। খাঁটি বর্ম্মী নাচের সঙ্গে ভারতীয় নাচের পার্থক্য অল্প নয় বটে, তবু কোন কোন বিষয়ে ভারতীয় নৃত্যের কিছু কিছু লক্ষণ তার মধ্যেও পাওয়া যায়। য়ুরোপীয় নাচে পায়ের প্রভাব যতটা, বর্ম্মী নাচে ততটা নয়। পায়ের চেয়ে হাত, মাথা ও দেহের ভঙ্গিই তার ভিতরে বেশী দেখা যায়। ব্রহ্মদেশের আর একরকম নাচকে পালোয়ানি নাচের অন্তর্গত করা যায়। সে নাচ যারা নাচে, তাদের দেহের নমনীয়তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। অনেক নাচের সঙ্গে ওরা মাঝে মাঝে গানও গায়। "University Troupe"এর নাচে আমরা ব্রহ্মদেশের নিজস্ব বিশেষত্বেরই পরিচয় পাব! এবং আমাদের স্থির বিশ্বাস, সে-বিশেষত্ব প্রতিটি দর্শককে করবে মুগ্ধ, বিস্মিত, পুলকিত এবং চমৎকৃত।

*

বিলাতের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম প্রধান অভিনেতা স্যর জেরাল্ড্ ডু মরিয়ারের মৃত্যু-সংবাদ শুনলুম। তাঁর পিতা হচ্ছেন জর্জ্জ ডু মরিয়ার, তিনি 'ট্রিল্‌বি' নাটক লিখে সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। জেরাল্ড্ ডু মরিয়ার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে তিনি রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন। নিজের প্রতিভা-গুণে অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমসাময়িক অন্যান্য অধিকাংশ অভিনেতার উর্দ্ধে আসনলাভ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গভর্মেণ্ট তাঁকে "স্যর" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। নাট্যকার ব্যারির নাটকাবলীতে তাঁর চেয়ে ভালো অভিনয় আর কেউ করতে পারেন নি। তাঁর অভাবে বিলাতী নাট্যজগৎ বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল

*

ভ্রম-সংশোধন। গেল-বারে "নাচঘরে"র প্রথম পাতায় যে ছবিখানি বেরিয়েছিল, তা "রূপলেখার একটি দৃশ্য" নয়, "ঋণমুক্তি"র একটি দৃশ্য।

—— —

"ঋণ-মুক্তি"র গান

["ঋণমুক্তি"র গীতাবলীর মধ্যে সাতখানি গান শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। কেবল সেই কয়টি গানই এখানে প্রকাশ করা হ'ল]

(১)

নর্ত্তকীদের গান—

মুঞ্জরিত কুঞ্জবনে
মঞ্জুবীণা বাজ্‌ছে মনে, পুঞ্জ-ভ্রমর গুঞ্জরণে।

*

লজ্জাসরম রইবেনাকো,
ঘোম্‌টা মুখে সইবেনাকো,
চঞ্চলি তোল্ অঞ্চলিকা মত্ত-মলয় সমীরণে।

*

আন বারুণী, নাচ্ তরুণী,
চন্দ্রহারের ছন্দতে,
অন্তরে তোর নন্দিত কর্
গন্ধরাজের গন্ধতে।

*

দেখ্‌লে বঁধুর মধুর-আঁখি,
গায় যে বুকের কোকিলপাখী
অধর-কুসুম ফুটবে মুহু চুম্বনে আজ ক্ষণে ক্ষণে!

[২]

বিলাসিনীর গান—

মোহন তারকা, শোহন চন্দ্র!
গায়ক পাপিয়া, নটিনী তটিনী, পবনে নবীন মুকুল-গন্ধ।

*

জোছনা লেখে কি প্রেমের লিপিকা,
প্রেমিক-বীণায় রণিছে দীপিকা,
হৃদয় শুনিছে হৃদয় গীতিকা, কি মধু যামিনী, মাধুরী-ছন্দ।

* * * * * *

ক্ষণিকে আঁধার গগনে কালিমা লিপ্ত!
দীপ্ত অশনি দৃপ্ত পুলকে ক্ষিপ্ত!

*

রুদ্রের সাথী ঝঞ্ঝার জ্বালা,
কণ্ঠে দোদুল কঙ্কাল-মালা,
রক্ত-চিতায় মৃত্যুর ডালা, ভস্ম উড়িছে ভুবন অন্ধ—
মরেছে তারকা মরেছে চন্দ্র!

[৩]

নর্ত্তকীর গান—

আছে প্রাণে ভরা কত শত আশা,
সখা, জীবন চাহে যে ভালোবাসা।

*

জাগিবে নিতি চাঁদিনী রাতি,
পরাব গলে মালিকা গাঁথি,
হবে মিলন-লীলাতে কাঁদা-হাসা ॥

*

ভোরের বাতাসে জাগিলে ধরা,
হেরিবে কাননে কুসুম ঝরা,

*

তখন যেওনা তুমি চ'লে,
ব্যথিত পরাণ পায়ে দলে,
হায়, মুছিয়া উষার রাঙা-ভাষা ॥

[৪]

অনুর গান—

সূয্যি-মামা, সূয্যি-মামা, ঘুমোও কোথায় রাতে?
আজ্‌কে আমার সাধ হয়েছে যাব তোমার সাথে।
রাঙা মেঘের ভেলায় ক'রে
ভাস্‌বো যখন—হাস্‌বো জোরে,
আকাশ-গাঙে পেরিয়ে গেলেও ভয় পাব না তাতে।

[৫]

অনু ও রাখাল-বালকের গান—

অ— প্রজাপতির মতন আমার থাক্‌লে ছটো ডানা,
যেঁা ক'রে ভাই যেতাম কোথায়, নেইকো সেটা জানা!
রা— মৌমাছি ভাই হতেম যদি,
মধু খেতাম নিরবধি,—
ছজনে—মৌমাছি আর প্রজাপতির নেইকো কিছুই মানা।
অ— হতেম যদি চাঁদের মতন,
রা— আমি যদি হতেম তপন,
ছজনে—ফুর্ত্তিতে মন উঠ্‌ত গেয়ে তানা-নানা-নানা!

[৬]

ভিক্ষুকের গান—

মারো, আবার মারো!
আমার মাথা দাও নামিয়ে যতই নীচে পারো।
মার্‌বে যতই গায়ের জোরে,
ধন্য ততই ক'রবে মোরে,
ব্যথায় আরো ডাক্‌ব তাঁরে, বাস্‌বো ভালো আরো!

[৭]

নেপথ্য-সঙ্গীত—

জয় প্রজাপতি মহারাজ, জয় জয় হে!
তব গুণগীতি জাগে নিতি, ক্ষিতিময় হে!
জীবনের ছুখ-তাপে,
নিয়তির অভিশাপে,
পুলকে ভূলোকে কর মধু সমুদয় হে!
মরণ যখন ডাকে,
আশাহারা অভাগাকে,
ওগো মহাবীর, তুমি দাও বরাভয় হে!

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ ঋণমুক্তি (কালী ফিল্মস্)

প্রযোজক—শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলি
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
শব্দযন্ত্রী—শ্রীমধু শীল
আলোক-শিল্পী—শ্রীননী সান্যাল
সম্পাদক—শ্রীজ্যোতিষ মুখোপাধ্যায়

*

অগুন্তি বছর আগে একদা এক রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করতেন। নাম, যযাতি। বিলাসী ও অমিতাচারী। শাস্ত্র-বাক্যে নেই আস্থা। মৃত পিতার পারলৌকিক কাজে নেই নিষ্ঠা। ফলে, প্রেতলোকের অধিবাসী পিতার মনে সুখ নেই—স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ। পিতা [নহুষ] স্বর্গে গমন করতে না পেরে দেবতাদের শরণ নিলেন। তাঁরা উপদেশ দিলেন, পুত্রকে নহুষ অনুরোধ করুন, সে যেন নরমেধ যজ্ঞ করে। তাহ'লেই নারায়ণ তুষ্ট হবেন।

একদিন উৎসব-মত্ত যযাতি স্বপ্নভঙ্গে দেখলেন, তাঁর পিতার প্রেতমূর্ত্তি। পিতার কাতর বাক্য শুনে যযাতির মন বদলে গেল। তিনি কুসংসর্গ পরিহার ক'রে পিতার মুক্তির জন্যে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন।

সে যজ্ঞের প্রধান উপচার হবে—একটি আট বছরের ছেলে। তারই অন্বেষণে রাজার অনুচরবর্গ লাঠি-সোঁটা নিয়ে বেরুলো।

•

সেই রাজ্যে বাস করেন শ্রীবাস। যেমন ধার্ম্মিক তেমনি সত্যনিষ্ঠ। পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে সুদখোর উত্তমসেনের কাছে ঋণ করেছিলেন। মনে করেছিলেন, কায়িক পরিশ্রমে সে ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু বিধি বাম। ঋণ শোধ হ'ল না। উত্তম সেন তাঁকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিলে। শ্রীবাস স্ত্রী লক্ষ্মী ও পুত্র অনুকে নিয়ে গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

•

কিন্তু তাতেও পার নেই। উত্তমসেন রাজার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে (পরামর্শ নয়, ষড়যন্ত্র; তবে সে ষড়যন্ত্রে রাজা বিশেষ যোগ দেন নাই, কারণ আট বছরের ছেলেকে বলি দিতে তাঁর মন চাইছিল না) শ্রীবাসের ছেলে অনুকে যজ্ঞে প্রেরণ করলে। অনু যখন বুঝলে যে সে তার পিতাকে ঋণমুক্ত করলে তখন সে স্বেচ্ছায় রাজার পাইকদের সঙ্গে যজ্ঞস্থলে গিয়ে হাজির হ'ল। তারপর সেখানে সাক্ষাৎ মৃত্যুর সামনে কী আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটল, তা ফাঁস ক'রে দিয়ে নাই বা রসভঙ্গ করলাম।

•

"ঋণমুক্তি"-কে যে-সব অভিনেতৃরা রূপে রসে সঞ্জীবীত ক'রেছেন, তাঁদের পরিচয় নীচে দেওয়া গেল—

নহুষ—শৈলেশ চট্টোপাধ্যায়। যযাতি—শরৎ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবাস—তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। অনু—রাধারাণী। লক্ষ্মী—শ্রীমতী শিশুবালা। উত্তমসেন—

পার্ব্বতি চট্টোপাধ্যায়। শ্যামা—শ্রীমতী শান্তবালা। এঁরা ছাড়া আরও অনেকে আছেন।

*

"ঋণমুক্তি"র গল্প অপ্রচলিত নয়। এই পুরাণো পুরাণ-কাহিনীর মধ্যে যে চিত্তাকর্ষক রস-বস্তু নিহিত আছে, তাকে ফুটিয়ে তোলার কাজে কালী ফিল্মস্-এর সংগঠনকারীগণ সফলকাম হয়েছেন। ঋণমুক্তি দর্শকদের চিত্ত-জয় করেছে—বিশেষ ক'রে মহিলাদের।

এর প্রযোজনা বা পরিচালনার মধ্যে বড়ো-গলায় উল্লেখ করতে পারি, এমন কোন ত্রুটি পেলাম না। গল্পটির মধ্যে জোরালো গতির অভাব থাকলেও, কোনখানে তা আমাদের শ্রান্ত করে নি।

*

"ঋণমুক্তি"র শব্দ-যন্ত্রীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করি। দেশী ছবিতে এত ভালো recording সচরাচর শোনা যায় না।

ছবির সম্পাদনার কাজেও জ্যোতিষবাবু বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। কোথাও কোন অবান্তর জিনিষ প্রবেশ ক'রে ছবির রস-কে নষ্ট করেনি। এই কথাটি ইদানিং-কার একাধিক ছবি সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি নি।

*

"ঋণমুক্তির" অভিনেতা-নির্ব্বাচনের কাজে তার প্রযোজক অসামান্য কর্ম্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু যে কোন ভূমিকায় কোন অভিনেতাকে-ই Miscast করা হয় নি, তাই নয়—একাধিক ভূমিকার লোক সংগ্রহে ছবির প্রযোজক যে রসবোধ ও দর্শকদের তৃপ্তি দেবার জন্যে সদা-জাগ্রত মনের পরিচয় দিয়েছেন তার জন্যে তাঁকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। তাঁর এ প্রচেষ্টা সত্যিই অনুকরণীয়। আমরা বিশেষ ক'রে উত্তম সেন্-এর ভূমিকাটি লক্ষ্য করেই ঐ-কথা বলছি।

*

"ঋণমুক্তি"র বেশীর ভাগ গান রচনা করেছেন, আমাদের শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। গান লিখতে হেমেনবাবুর হাত যে কত মিষ্টি তার পরিচয় নাচঘরের পাঠকদের কাছে দেবার প্রয়োজন নেই নিশ্চয়। গায়ক-গায়িকারা তাঁর গানগুলির মর্য্যাদা রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। "ঋণমুক্তি"র নৃত্য-পরিকল্পনাও হেমেনবাবুর।

*

অভিনেতৃদের মধ্যে সব-চেয়ে বয়সে যে ছোট, তাকেই লেগেছে সব-চেয়ে ভালো। অন্থর ভূমিকায় রাধারাণীর অভিনয় সত্যিই চমৎকার। ছোট্ট মেয়েটিকে যে কী ব'লে সুখ্যাতি করব ভেবে পাচ্ছি না। অভিনয়ও যেমন করেছে, গান-ও গেয়েছে তেমনি। রাধারাণীকে আমি অসঙ্কোচে এ-দেশের যে-কোন baby-Starএর পাশে স্থান দিতে পারি।

*

তিনকড়িবাবুর অভিনয় মর্ম্মস্পর্শী হয়েছে। বিশেষ ক'রে, তাঁর শেষের

দিকের অভিনয় সহজে ভোলবার নয়! ধূলায় মাণিক খোঁজার সময়কার অভিব্যক্তিটুকু মনের মধ্যে ছাপ রেখেছে।

শিশুবালার "লক্ষ্মী"; শান্তবালার "শ্যামা"; শরৎ চট্টোর "যযাতি", এবং অন্যান্য ছোটখাটো ভূমিকাগুলি সু-অভিনীত হয়েছে। পার্ব্বতি চট্টোর "উত্তম সেন" এবং শৈলেশ চট্টোর "নহুষ" তো অভিনয় ও রূপসজ্জার দিক থেকে আমাদের মনে রীতিমতো বিস্ময় উৎপাদন করেছে।

•

"ঋণমুক্তি"র নেপথ্য-সঙ্গীত শ্রুতিমধুর হয়েছে। বিশেষ ক'রে যে-সব স্থানে ধীরেন দাস গান গাইছিলেন, সে-সব স্থানে ভারি আরাম বোধ করছিলাম।

"তোমার আসার পথে আমার আঁখি দেবে আঁকি
তুষার আলিম্পন

আমার ব্যথার বুকে তোমার আমন্ত্রণ"—এই দু-লাইনের গানখানি ভাষা ভাব এবং সুরের দিক থেকে হুবহু অনুকরণ হ'লেও ধীরেনবাবু সেখানি অতি সুন্দর ক'রে গেয়েছিলেন।

•

"নিউ থিয়েটার্সে"র রূপলেখা চিত্রে
শ্রীপ্রমথেশ বড়ুয়া ও শ্রীমতী উমাশশী

"ঋণমুক্তি"র ফোটোগ্রাফী ভালোই হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ যা লক্ষ্য করলাম তা হচ্ছে এই,—Mid-shot বা Mid-close-up-এর সময় অভিনেতাদের মুখে যে অভিব্যক্তি প্রকাশিত হচ্ছিল, তার সঙ্গে Close-up-এর সময়কার অভিব্যক্তি যেন খাপ্ খাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল যেন, Mid-shot এবং Close-up এই বিভিন্ন অবস্থায় ক্যামেরার কাজের সময় অভিনেতৃদের expression-এর ভিতর সামঞ্জস্য বার বার ব্যাহত হচ্ছে। এ-ধরণের টেক্‌নিক্ দেশী-ছবির প্রথম অবস্থায় নজরে পড়ত। এখনো কেন পড়বে?

সে যাই হোক, মোটের উপর কালী ফিল্মসের তৃতীয় অবদান "ঋণমুক্তি" সকল দিক দিয়ে বিশেষ উপভোগ্য এবং হৃদয়গ্রাহী হ'য়ে উঠেছে। "রূপবাণীর" ছবির পরদায় আমরা এর দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে নিঃসংশয় হয়েছি।

•

"ঋণমুক্তি"র সঙ্গে "গাগরি-ভরণে" নামে যে ছোট গীতি-চিত্রখানি দেখানো হয়েছে, সেটিও গানে এবং মূক-অভিনয়ে মন্দ লাগেনি। "গাগরি ভরণে"-তে গান গেয়েছেন, শ্রীমতী হরিমতী এবং মূক-অভিনয় করেছেন—শ্রীমতী মায়া।

•

চিত্রায় কাল থেকে "রূপলেখা" সুরু হবে। আশা করছি সামনে সপ্তাহে রূপলেখার কথা পাঠকদের জানাতে পারবো।

•

হলিউড্ গল্পিকা:

অনেক পাঠক গত-সংখ্যায় লেখা য়্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার্স্ আর্টস্ এণ্ড সায়ান্স্ সম্বন্ধে বিশদ্‌ভাবে জানতে চেয়েছেন।

এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হয়েছে, ১৯২৭ সালে। এঁরা বছরে বছরে যে-সব শিল্পীদের পুরস্কৃত করেন তারা নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। গত কয়েক বছরে যারা এবং যে সকল ছবি এঁদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছে. নীচে তার তালিকা দেওয়া গেল:

১৯২৮ সালে

অভিনেত্রী—শ্রীমতী জেনেট্ গেনর (সেভেন্থ্ হেভেন্, ষ্ট্রীট্ এঞ্জেল এবং সানরাইজ ছবিগুলিতে অভিনয়ের জন্য)

অভিনেতা—এমিল জেনিংস্ (ওয়ে অফ্ অল্ ফ্লেশ্ ও লাষ্ট্ কম্যাণ্ড্)

পরিচালনা—ফ্র্যাঙ্ক্ বোরজ্যাজ্ (সেভেন্থ্ হেভেন্) ও লুই মাইলষ্টোন (টু য়্যারেবিয়ান নাইট্স্)

শ্রেষ্ঠ ছবি—উইঙ্স্ (প্যারামাউণ্ট্) ও সান্‌রাইজ (ফক্স্)

আলোক-শিল্প—চার্লস্ রশার ও কার্ল ষ্ট্রাস্ (সানরাইজ)

কারুসজ্জা পরিচালনা—উইলিয়াম ক্যামেরণ মেনজিজ্ (টেম্পেষ্ট্ ও ডাভ্)

লিপি-নৈপুণ্য—বেণ হেক্‌ট্ (আণ্ডারওয়ার্ল্ড্ নামক ছবির জন্য) ও বেন্‌জামিন গ্লেজার (সেভেন্থ্ হেভেন্)

Title—জোসেফ্ ফারন্হাম (টেলিং দি ওয়ার্লড্ ও ফেয়ার কে-ইড্)

চিত্রজগতে নবযুগ আনয়ন করার জন্য—ওয়ার্ণার ব্রাদার্স। ওয়ার্ণার ব্রাদার্স সেই বছর The Jazz Singer নামে প্রথম স-শব্দ ছবির প্রবর্ত্তন করেন।

১৯২৯ সালে—

অভিনেত্রী—মেরি পিক্‌ফোর্ড (কোকেট্)

অভিনেতা—ওয়ার্ণার ব্যাক্‌ষ্টার (ইন ওল্‌ড্ য়্যারিজোনা)

পরিচালনা—ফ্রাঙ্ক্ লয়েড্ (উইরি রিভার, ডিভাইন লেডী ও দি ড্র্যাগ্)

শ্রেষ্ঠ ছবি—ব্রড্‌ওয়ে মেলডি মেট্রো)

আলোকশিল্প—ক্লাইড্ ভিয়া (হোয়াইট্ শ্যাডোজ্ ইন দি সাউথ্ সীজ্)

কারুসজ্জা পরিচালনা—সেড্রিক গিবন্‌স্ (ব্রিজ অফ স্যান লুই রে)

লিপি-নৈপুণ্য—হ্যান্‌স্ ক্রেলি ডিভোর্সী (পেট্রিয়ট)

১৯৩০ সালে—

অভিনেত্রী—নর্মা শিয়ারার (দি ডিভোর্সী)

অভিনেতা—জর্জ্জ আর্লিস্ (ডিসরেলি)

পরিচালনা—লুই মাইল্‌ষ্টোন (অল কোয়ায়েট্ অন দি ওয়েষ্টার্ণ ফ্রন্ট্)

শ্রেষ্ঠ ছবি—অল কোয়ায়েট্ (ইউনিভার্স্যাল)

আলোকশিল্প—জোসেফ রাকার ও উইলার্ড্ ভ্যানডার (উইথ্ বার্ড্ য়্যাট্ দি সাউথ্ পোল)

কারুসজ্জা পরিচালনা—হারম্যান রস্ (কিং অফ জ্যাজ্)

শব্দ-যন্ত্র-নৈপুণ্য—মেট্রো (বিগ হাউস্)

লিপি-নৈপুণ্য—ফ্রান্সেস মেরিয়ন (বিগ্ হাউস্)

১৯৩১ সালে—

অভিনেত্রী—মারি ড্রেস্‌লার (মিন্ এণ্ড বিল্)

অভিনেতা—লাওনেল ব্যারিমুর (ফ্রী-সোল)

পরিচালনা—নর্মান টোরগ (স্কিপি)

শ্রেষ্ঠ ছবি—সিমারন্ (রেডিও পিক্‌চার্স)

লিপি-নৈপুণ্য—জন মঙ্ক্ সন্‌ডাস্ (ডন্ পেট্রল)

আলোকশিল্প—ফ্লয়েড্ ক্রস্‌বি (টাবু)

কারুসজ্জা পরিচালনা—ম্যাকস্ রী (সিমারণ)

শব্দ-যন্ত্র-নৈপুণ্য—প্যারামাউন্ট্।

১৯৩২ সালে—

অভিনেত্রী—হেলেন হেউজ্ (ফেয়ার ওয়েল টু আর্ম্‌স্)

অভিনেতা—ফ্রেডরিক মার্চ্চ (ডাক্তার জেকিল ও মিষ্টার হাইড্)

অন্য গুলো জানা নেই, কেউ জানালে বাধিত হব।

•

গ্রেটা গার্বোর সম্বন্ধে গুজবের অন্ত নেই। শোনা গেল, সম্প্রতি তিনি এবং তাঁর পরিচালক (মানে, ছবির পরিচালক) রুবেন ম্যামুলিয়ান নিউ-ইয়র্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন—অবশ্য বিভিন্ন ট্রেণে।

জনরব প্রচার করছে যে, পরস্পরের সঙ্গে গোপনে উদ্বাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যেই তাঁরা নিউইয়র্ক যাচ্ছেন।

গ্রেটা গার্বো যখন বিবাহ ক'রে একটিমাত্র লোকের সম্পত্তিরূপে দিন যাপন করবার আয়োজন করবেন, তখন পৃথিবীর নানা দেশে বেদনায় অনেক তরুণের হৃদয় বিদীর্ণ হবে।

•

হ্যারল্ড লয়েডের তিন বছরের ছেলে তার বাপের সঙ্গে Cat's paw নামক ছবিতে অভিনয় করবে ব'লে শোনা যাচ্ছে।

মার্লেন ডিট্রিক্ আগেই তাঁর মেয়েকে নিয়ে স্কারলেট এম্প্রেস ছবিতে অভিনয় করবেন। জ্যাক হোল্ট-ও তাঁর ছেলেকে পরবর্ত্তী ছবিতে নামানোর সঙ্কল্প করছেন।

সপরিবারে অভিনয় করবার ইচ্ছা সংক্রামক হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩০।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

সঙ্কলন

ড্রামা

(শ্রীঅষ্টাবক্র)

পুনরাবৃত্তি

৪

জাঁ-ক্রিস্তাফের মতন চরিত্র সব সময়ে সৃষ্ট হয় না। রমা রলাঁর অন্য রচনাগুলি (অন্ততঃ নাটকগুলি) তৃতীয় শ্রেণীর। তিনি জাঁ-ক্রিস্তাফের standard আর কোথাও রাখতে পারলেন না; না রাখাই ভাল। আমার বিষয় হচ্ছে ড্রামা এবং প্রতিপাদ্য হচ্ছে নাটকে আমাদের দেশে ট্র্যাজাডি নেই। ট্র্যাজাডির একটা বিশেষ গুণ নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার বলি, ড্রামার অন্যান্য উপাদানের ক্ষেত্রে—অর্থাৎ অভিনয়ে এবং ষ্টেজে—আমরা এখনও মধ্যযুগে।

আমাদের দেশের অভিনয় সম্বন্ধে যখন ভাবি তখন অভিনেতাকে দোষ না দিয়ে আমি দোষ দিই নাট্যকারকে। যে অভিনেতা "রঘুবীরের" বিশেষণের পর বিশেষণের রেসিটেশন্ করে সে কখনও রক্তকরবীর রাজার একটাও বাক্য বলতে পারবে কি?

যে প্রতিদিন "দ্রুতবেগে প্রবেশ" এবং "ছুটিয়া প্রস্থান" করে, সে সংযমের ভিতর দিয়ে তার শক্তি প্রকাশ করবে কি ক'রে?

আমাদের দেশের নাটককার ভাবেন—"আমিই স্রষ্টা। অভিনেতা আমার অধীন। আমার যা ইচ্ছা তার তাই কর্ত্তব্য।" তাঁর ধারণা ষ্টেজ একটা রঙ্গমঞ্চ; অভিনেতা সজীব পুতুল; অভিনয়—after all একটা তামাসা। য়ুরোপের কিন্তু সব কথাই আলাদা।

প্রথমতঃ, এখানে ষ্টেজকে এখন সকলে বাস্তব ভাবে। তার অর্থ এই যে, ষ্টেজ বাস্তবিক জীবনেরই চিত্রপট—একটা ঘর যার fourth wall (যবনিকা) দর্শকের জন্য তুলে নেওয়া হয়। দর্শকরা যেন চুরি ক'রে জীবনের দৃশ্য দেখেন। এর ফলে অভিনয়ের মধ্যে বাস্তবতা এসেছে এবং দর্শকের মধ্যে এসেছে ড্রামার প্রতি শ্রদ্ধা। আলোকিত হয় শুধু ষ্টেজ; দর্শকরা সকলে অন্ধকারে থাকেন। তা ছাড়া একটা সুন্দর অভিনয়ের সূক্ষ্ম সৌকুমার্য্যের স্থলে (ভুল উচ্চারণের সহিত) কেউ encore encore চীৎকার করেন না।

অভিনেতা চায় অবসর। নাটককারের একটা কার্য্য হচ্ছে অভিনেতার জন্য অবসর গড়া। কিন্তু এর অর্থ হচ্ছে an understanding of mutual values। আমরা এর মূল্য বুঝি না। নাটককার ভাবেন কথাই সব; অভিনেতা ভাবেন, কথায় কি আছে, অর্থ ত ফুটাই আমি। আবার Producer এ সব নিয়ে মাথা ঘামান না; আমাদের দেশে Producer নেই, আছেন ম্যানেজার। তাঁর কর্ত্তব্য সাধারণ লোকের নাড়ীর উপর হাত রাখা; এ বিষয়ে তিনি দক্ষ।

নাটককার অভিনেতাকে কেমন অবসর দেয় তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় Galsworthyর Justiceএ (তৃতীয় অঙ্কে—তৃতীয় দৃশ্যে)—যেখানে সমস্ত দৃশ্যে একটাও কথা নেই। সমস্ত দৃশ্যের ব্যঞ্জনা শুধু অভিনেতার উপর নির্ভর করে। কেউ এইটাকে expressionism, symbolism ইত্যাদি ভাববেন না। এই গুলো হচ্ছে আর্টের শত্রু। যে জিনিষটা যতই মহৎ, তা ততই সরল। Expressionism সরলতা

নষ্ট ক'রে যা গ'ড়ে তোলে তা আর্ট নয়, আর্টের বিদ্রূপ। কৌতুকই তার মূল; কামারের বিদ্যা তার উপাদান। জার্মানরাই আজকাল এই expressionismএর সব চেয়ে উপাসক।

Prodnecerএর কাজ হচ্ছে নাট্যকার এবং অভিনেতার সহায়তা করা—বাস্তবিক দৃশ্য প্রস্তুত ক'রে। দৃশ্যের অর্থ আমাদের দেশে এখনও বেশীর ভাগ অবাস্তর scene গুলি। য়ুরোপের ষ্টেজে তা নয়। এখানে ষ্টেজের রচনায় Producerও ড্রামার আর্টে সহায়তা করে। আজকালকার ষ্টেজে আলোছায়ার পরিচালনায় নাটকের অনেকটা অর্থ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এই এই পরিচালনায় Producerএর রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

সম্প্রতি লণ্ডনের সেভয় থিয়েটারে Journey's End ব'লে যে নাটক চল্‌ছে তাতে তিন অঙ্ক এবং ছয় দৃশ্য। কিন্তু setting একই। সমস্ত action গত মহাযুদ্ধের ক্ষেত্রে। কখন রাত কখন দিন, কখন সন্ধ্যা এবং কখন প্রভাত। এই ভিন্ন ভিন্ন সময়ের ব্যঞ্জনা নাটককার করতে পারে না,—সে শুধু কথা লিখে দেয়—অভিনেতাও করে না, করে Producer। তা ছাড়া একটা নাটকের যে রকম theme ঠিক সেই রকম atmosphere গ'ড়ে তোলা অনেকটা Producerএরই কাজ। Producerএর মূল্য ঠিক কোন্ জায়গায় এর একটা উদাহরণ দিলাম অতি-আধুনিক একটা ফরাসী নাটক থেকে। নাটককারের সিনেরিও এই:

"ক্রমশঃ সব অন্ধকার হ'য়ে যায়। বীণার ধ্বনি এবং হিন্দুর স্বর আস্তে আস্তে বিলীন হ'য়ে যায় দূরে—বহুদূরে। তারপর সব শান্তি-চু এক মিনিটের জন্য। আবার আলোর প্রকাশ হয়—ক্রমশঃ এবং পূর্ণ।" একেই বলে Producer এর জন্য অবসর গ'ড়ে তোলা, অবশ্য জোর ক'রে নয়, আর্টের জন্যেই।

সেকভের অনেক নাটকে এই রকম উদাহরণ পাওয়া যায়। Cherry Orchardএ প্রথম দৃশ্য এবং শেষ দৃশ্যের মধ্যে করুণ পরিবর্ত্তনের সূচনা দেয় Producerএর আর্ট। ইবসেনের কয়েকটি নাটকের সিনেরিও এই: Evening during the scene। এর অর্থ-প্রকাশ Producerই করে।

৫

অভিনয় যতই সুন্দর হ'ক না কেন তার বাস্তবিকতা নির্ভর করে নাটকের উপর। আমাদের নাটকগুলো সবই অবাস্তব। প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং কথাগুলো বিশেষণে ভরা; শোকের উচ্ছ্বাসেও বংশীর সঙ্গে গান।* যেখানে চুপ ক'রে থাকা স্বাভাবিক সেখানে আমরা জোরে কথা বলি; যেখানে গতির দ্বারা ভাবের নিদর্শন হওয়া উচিত সেখানে গান করি। এইটে আমার মতে জড়বাদ।

ড্রামা হচ্ছে জীবনের প্রতিমূর্ত্তি। জীবনে ত সব জিনিষেরই মূল্য আছে। আমাদের ঘরে একটা বাক্স থাকে তার সঙ্গেও আমাদের বন্ধুত্ব। সকলেই আমাদের নীরব আত্মীয়—যাকে আমরা নিষ্প্রাণ ভাবি তার চেতনা জাগে আমাদের গভীর অনুভূতির সময়ে। তখন সব জিনিষই আমাদের কাছে এক একটা ভাবের প্রতীক। দ্বার খোলে এবং বন্ধ হয়, খাঁচার পাখী কখনও গান গায়, কখনও চেঁচায়। এই সব ছোট ছোট জিনিষগুলোর মূল্য বড় হ'য়ে ওঠে নাটককারের রচনায়। মানুষের মনের ভাবগুলি ব্যাপ্ত হয় দৃশ্যে; দৃশ্য সহায়তা করে atmosphere সৃষ্টি করতে। নাটককারের সাধনা বড়ই কঠিন। তাকে অনেক লোক বাদ দিতে হয়, শব্দরচনার চাতুর্য্যই তার একমাত্র কার্য্য নয়। এই সম্বন্ধে Galsworthyর মত এই:

"The aim of the dramatist to employ naturalistic technique is obviously to create such an illusion of actual life passing on the stage as to compel the spectator to pass through an experience of his own, to think and talk and move with the people he sees thinking, talking and moving with him. A false phrase, a single word out of tune or time will destroy the illusion……We want no more bastard dramas, no more attempts to dress out the simple dignity of every day life in the peacock feathers of false lyricism; no more straw stuffed heroes and heroines," (Theoretical Writings.)

এই সম্বন্ধে রম রলাঁ আরও প্রবল ভাবে লিখেছেন:

Adieu, les psychologies compliquees, les subtiles rosseries, lés obscures symbolismes, tout cet art de salons on d' acloves ! II serait depayse, ennuyeux, ridicule chez nous. (p. 125)

—Le Theatre Nouveau.

কিন্তু গল্‌সোয়ার্দি এবং রলাঁর চেয়েও প্রবল পরিণত মত মেটারলিঙ্কের:

"There is a tragic element in the life of everyday that is far more real, far more penetrating and far more akin to the true self that is in us than in the tragedy that lies in great adventures. It goes beyond the eternal conflict of duty and passion. Its province is rather to reveal to us how truly wonderful is the mere art of living; to hush the discourse of reason and sentiment, so that above the tumult may be heard, the solemn, uninterrupted whisperings of man and his destiny."

অতি-আধুনিক ট্র্যাজিডির রচনা এই নিয়ে। আমাদের জীবন, সাধারণ মানুষ, সাধারণ কথা, সাধারণ দৃশ্য—এদের মধ্যেই সত্য; সত্যের মধ্যেই শিব এবং সুন্দর! জীবনের বাহিরে যাবার দরকার নেই। সাধারণকে ত্যাগ ক'রে লাভ কি?

এইবার আমি একটা ভাল ট্র্যাজিডির বর্ণনা করি। নাটকের নাম "মায়া।" প্যারিসে এর অভিনয় দেখে আমার মনে যে ভাব জাগ্রত হয় তা নিজের ভাষায় ব্যক্ত না ক'রে আর একজনের সহায়তা নিলাম:

"L'ame s'ennoblit dans le Voisinage des mysters insondables; elle puise dans ce travail d'xploration avec de sa petitesse, celui de sa grandeur,"

৬

মায়া একটা বড় আইডিয়ার অভিব্যক্তি। আইডিয়া এই যে বেশ্যার জীবনে প্রতিদিন "disincarnation progressive" চলেছে। বেশ্যার নিজের কোন অস্তিত্ব নেই—সে পুরুষের ইচ্ছার ছায়া। তার পথের আরম্ভেই তার শেষ। নাটককার কোন সামাজিক সমস্যার কাছেও যায় না। জীবনের একটা অসুন্দর অংশে সে দেখে সুন্দরের লীলা এবং সেই-টা প্রকাশ করে তার রচনায়। বলা বাহুল্য ফরাসী জাতির নৈতিক বল খুবই বেশী। তা না হ'লে স্বামী-স্ত্রী বেশ্যার নাম শুনলে চটতেন, এবং একসঙ্গে নাটক দেখতে যেতেন না।

নাট্যারম্ভে প্রাক্‌কথন দ্বারা নাটককার তার সৌন্দর্য্যবোধ দেখিয়ে দেয়,

* হিন্দীর একটা নাটকে শ্মশানে ব'সে মৃত পুত্রকে কোলে রেখে শৈব্যা রাণী বেহাগের আলাপ হারমোনিয়মের সহিত করেন।

এবং তার আইডিয়ার আভাসও দেয়। তার পর সে প্রমাণ করতে প্রস্তুত হয় যে 'আমি যে সৌন্দর্য্য দেখেছি সেটা অসুন্দরের মধ্যে নিহিত হ'লেও সত্য।'

সমস্ত নাটকের দৃশ্য একই ঘরে। ঘর মার্সেয়্যের এক বেশ্যার, যার নাম বেলা। ঘরে কোন বিশেষ সাজসজ্জা নেই; সবই সাধারণ।

প্রথমতঃ আসে একজন নাবিক। সে চায় রাতের আশ্রয়; পায়। ভোরবেলায় সে আবার চ'লে যায়—সমুদ্রের যাত্রী সে। তার পর সাধারণ জীবন। বেলা হাসে, গল্প করে; জান্‌লায় ব'সে সেলাই করে এবং বলে, "এই ঘরে একটা ফাঁক এবং এইখানটা" ইত্যাদি। সবই সাধারণ। আবার রাত্রি। এইবার আসে একজন বৃদ্ধ শ্রমজীবী। হাতে তার কয়েক মুদ্রা। সে গোণে; মুদ্রা কম। তার মুখে কথা নেই। রক্তমাংসের এই বৃদ্ধ তার কামপিপাসায় কত দীন! করুণ ভাবে সে তাকায় বেলার দিকে; বেলা একটু হাসে, আর দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়। ক্ষমার মূর্ত্তি সে।

এই রকম ক'রে অনেকে আসে, দিনের বেলায়, রাত্রে—সব সময়েই। চিত্রকর এসে চিত্র এঁকে চ'লে যায়—নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মতন। একজন নরওয়ের লোক এসে কত গল্প করে; বলে—"আমাদের দেশে কত নদী, কত পাহাড়, কত পাখী, কত শিশু।" শিশুর নাম শুনে বেলা একটা ফল দেয় তাকে এবং বলে—"এইটা কাউকে দিয়ে দিও।" লোকটা ফল নেয় না। বেলার দানে সে লজ্জিত।

একজন আহত যোদ্ধা এসে কাঁদে; বলে, সে কত দুর্ভাগ্য! বেলাও কাঁদে, আবার হাসে—পুরুষটাকে হাসাবার জন্য। তার পর একজন নিরাশ প্রেমিক এসে রূপ বর্ণনা করে তার প্রিয়ার। তার পকেটে চুরি করা একটা বড় রুমাল—তার প্রিয়ারই; পুরুষটা বড়ই অশান্ত; তার নিজের জন্য কোন ভাবনা নেই। তার ছেঁড়া বস্ত্র সেলাই ক'রে দেয় বেলা; এবং তাকে জল খেতে দেয়। কিন্তু তবু পুরুষটি অশান্ত; কোলে মুখ গুঁজে হাঁফায়। চুপি চুপি বেলা তার পকেট থেকে রুমালটা বার ক'রে নেয় এবং অন্য ঘরে গিয়ে সেইটে দেয় তার গায়ে। কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে আসে—সুন্দর তার মূর্ত্তি। পুরুষ তাকে দেখে, মুগ্ধ হ'য়ে যায়—শ্রদ্ধায়। তার পর সে লুটিয়ে পড়ে এই নারীর চরণতলে আর বলে—"প্রিয়া আমার।" বেলা করুণ স্বরে তারই শব্দের প্রতিধ্বনি করে।

আবার দিন, আবার রাত, আসে আর যায়। সর্ব্বশেষে আসে একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ।* তার মাথায় পাগড়ি, কানে কুণ্ডল, চোখে তেজ। তার কথায় কিসের যেন মাদকতা। তার সঙ্গে আসে একজন বীণাবাদক—বীণা হাতে ক'রে। যখন এই দুজন আসে তখন বেলা অনুপস্থিত। গোধূলির বেলা তখন। দুজনেই চুপ ক'রে বসে। তার পর বীণাবাদক জিজ্ঞেস করে—"সে যে আসে না?" হিন্দু জবাব দেয়—"থাম, থাম!" দুজনেই কত কল্পনা করে, কত করুণ ভাবে গ'ড়ে তোলে তাদের মানসপ্রিয়ার প্রতিমূর্ত্তি! আবার জিজ্ঞেস করে বীণাবাদক—"সে দেখতে কেমন?" হিন্দু কখনও বেলাকে দেখেনি, তার ঘরেই এর আগে প্রবেশ করেনি। তবু সে জবাব দেয়, "দেখতে? আমি তাকে দেখেছি! বাংলা দেশের নদীর বুকে নৌকোর উপর রাতের অন্ধকারে তার চুলগুলো উড়তে থাকে! আহা!" চোখ বুজে সে নিজের কল্পনায় ব্যস্ত। হঠাৎ বাহিরে চেঁচামেচি ছুটাছুটি! হিন্দু দ্বার বন্ধ ক'রে দেয়। আবার শান্তি। হিন্দু এসে ব'সে পড়ে। বীণাবাদক দেয় তার আঙ্গুল বুলিয়ে বীণার উপর। মত্ত সুরে ঘরটা যেন ঝঙ্কৃত হ'য়ে ওঠে। তার পর বাহিরে ছায়ার মতন একটা মূর্ত্তি এসে দাঁড়ায়—বেলার কণ্ঠে সে বলে—"দ্বার খোলোনা? কে ভিতরে? এ যে আমার ঘর!" দুজনেই চুপচাপ! বীণাবাদক জিজ্ঞেস করে, "এই কি সে?" হিন্দু বড়ই নর্ভাস, তার মানসপ্রিয়ার প্রতিমা যে ভাঙে! হিন্দু বলে—"না! না! সে অপর একজন। এ নয়!" বেলার ছায়ামূর্ত্তি কাঁপে। আবার দ্বারে করাঘাত—"ওগো দ্বার খোলো!" গোধূলির করুণ আভা রাত্রে মিশে যায়—ষ্টেজ ক্রমশঃ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আসে—সম্পূর্ণ অন্ধকারে। বাহিরে বেলা; ভিতরে এই দুজন পুরুষ—বড়ই নিঃসঙ্গ এবং করুণ। হিন্দু একটু ভাবে। তারপর চীৎকার ক'রে উঠে—"এই যে সে! এই যে সে! এই দেখ—তার উদ্বেলিত বক্ষঃস্থল! তার পদ্মলোচন! আঃ! যখন এ নৃত্য করে—তখন, তখন সে অপ্সরা! অপ্সরা! অপ্সরা!!"

ষ্টেজ এখন অন্ধকারে। হিন্দুর স্বর শোনা যায় দূরে। তার পর সব শান্তি। আমরা ভাবি, কে এ নারী? সকলে এসে নিজেরই প্রতিমা গ'ড়ে নেয় এর মধ্যে! কি করুণ এর জীবন! কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে পারি না। আবার আলোকিত হয় ষ্টেজ—প্রথম দৃশ্যের মতন। সেই ঘর, সেই সাজসজ্জা সেই নারী, জানলায় বসে সেলাই করে এবং সেই সুরে, সেই কথা বলে—"এই ঘরে একটা ফাঁক—" মাত্র তিন চার কথার পরেই যবনিকা। ড্রামার শেষ হয়।

———

* হিন্দুব্রাহ্মণ—বেলা-মায়া—বাংলা দেশ প'ড়ে কেউ ভাববেন না যে আমি নিজের তরফ থেকে এই সব adapt ক'রে দিচ্ছি। এইগুলো সব মূল ফরাসীতে।

৫ম সপ্তাহ! ৫ম সপ্তাহ!

= ক্রাউনে =

=ভারত লক্ষ্মী পিকচার্সের জয়স্তম্ভ=

১৪ই এপ্রিল শনিবার সগৌরবে ৫ম সপ্তাহে পড়িল

শনি ও রবি তিনবার, ৩টা, ৬-১৫ ও ৯-৩০	মনসা ভাসান গানে অতীত স্মরণে আনে !	অন্যান্য দিন দুইবার ৬-১৫ ও ৯-৩০

নব সংস্কৃত

চাঁদের বিজয় অভিযান আবার দেখুন !!!

পূর্ব্বাহ্নে আসন সংগ্রহ ও সিট রিজার্ভ করুন।

সেণ্ট্রাল পাব্লিসিটি বুরো

১৪০, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট,

ফোন নং—৩১৪৫ কলিকাতা

সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রিকা, টাইমটেবল-বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা প্রণয়ন, পোষ্টার, হাণ্ডবিল, হোর্ডিং, রঙ্গমঞ্চ ও ছায়াচিত্রে শ্লাইড ও ড্রপসিন বিজ্ঞাপন প্রভৃতি

বিবিধ বিজ্ঞাপন বিষয়ে

আমাদের

বিশেষজ্ঞগণ আপনার ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে বিজ্ঞ বিধান দান করিবেন।

আপনার ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ যদি কামনা করেন তাহা হইলে আজই আমাদের প্রতিনিধিকে আহ্বান করুন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র পাঠাইলে বিস্তারিত বিবরণ প্রেরণ করিব। ইতি

ম্যানেজার—সেণ্ট্রাল পাবলিসিটি বুরো

১৪০, কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কালী ফিল্মসের

চিত্রনাট্যকার
ও
প্রযোজক
শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী

নব উপচারে প্রস্তুত
নব মন্ত্রে সঞ্জীবিত
নব রস সম্ভারের
নূতনতম নৈবেদ্য

ঋণ-মুক্তি

সঙ্গীত ও নৃত্যপরিকল্পনা
হেমেন্দ্রকুমার রায়

আধুনিক আর-সি-এ ফটোফোন যন্ত্রে গৃহীত

মহাসমারোহে দ্বিতীয় সপ্তাহ
শনিবার ১৪ই এপ্রিল, ১৯৩৪

রূপবাণী চিত্রগৃহে

কলিকাতা, ২৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
১২শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

৭ই বৈশাখ
১৩৪১

কলালাপ

বিশেষ কোন কারণবশতঃ 'নাচঘর' সম্পাদক এবার খ্‌তে পারেন নি।

•

শিল্পাচার্য্য শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রহ্মদেশের নৃত্য সম্পর্কে আমাদের একটী লেখা পাঠিয়েছেন—

১৮৮৩ কি ৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় মস্ত একটা প্রদর্শনী হয়েছিল, তাতে বর্ম্মা থেকে যে নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা এসেছিল দেখেছিলেম, অনেক কালের একটা মুছে-যাওয়া ছবির মতো একটু একটু যা মনে আছে, তা থেকে বর্ম্মার নৃত্যকলার সম্বন্ধে কিছু আভাস দেওয়া চলে না। নৃত্যরসিক যারা স্বচক্ষে বর্ম্মার নাচ দেখে এসেছেন এমন কয়জন মিলে এবারে কলিকাতায় সমুদ্রপারের স্বর্ণচৈত্য কাননের দেশের নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণকে নিয়ে আসছেন। নাচার সখ যাঁদের, নাচ দেখার সখ যাঁদের, তাঁদের পক্ষে এটা যে একটা সুবর্ণ সুযোগ তা বলতেই হবে।

ভ্রমণকারীদের লেখা থেকে চিত্রকারদের ছবি থেকে বর্ম্মার নৃত্যের অনেক প্রশংসা-সূচক ধ্বনি পাই কিন্তু অন্তর তাতে সাড়া দিলেও নিজের চক্ষে ব্যাপারটা দেখার আকাঙ্ক্ষা রহেই যায়। কলিকাতায় এবার এই বহুশ্রুত নৃত্যের আয়োজন সাধারণের জন্যে করে দিয়ে উদ্যোক্তারা কলা-রসিকদের পক্ষে সত্যই ভারি সুযোগ উপস্থিত করে আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ভারতের এই প্রতিবেশী নর্ত্তকমণ্ডলী আশা করা যায় প্রশংসাই পাবেন দর্শকদের কাছে।

ব্রহ্মদেশের অন্যতম বিখ্যাত
নর্ত্তকী
মা মে সিন্

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ রূপলেখা (নিউথিয়েটার্স)

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—প্রমথেশ চন্দ্র বড়ুয়া
সঙ্গীত পরিচালনা—রাইচাঁদ বড়াল
শব্দযন্ত্রী—লোকেন বসু
চিত্রশিল্পী—ইউসুফ মুলজী
ব্যবস্থাপক—অমর মল্লিক

*

এতদিন পরে বাঙলা চলচ্চিত্র-জগতে আর একজন পরিচালকের দেখা পাওয়া গেল—যথার্থ প্রথম শ্রেণীর পরিচালক, যাঁর আছে গল্প-গঠনের ক্ষমতা, রসবোধ এবং সর্ব্বোপরী যাঁর আছে সত্যিকারের শিল্প হচ্ছে!—"রূপলেখার পরিচালক শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া-কে অভিনন্দিত করছি অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রেরণায়!

*

একটা স্বীকারোক্তি করি। শ্রীযুক্ত বড়ুয়ার পরিচালনা-শক্তির উপর তেমন বিশেষ বিশ্বাস ছিল না। টকির প্রথম যুগে "বাঙলা ১৩৮৫" নামে যে ছবিখানি দেখেছিলাম, আমি সেই ছবিখানি স্মরণ ক'রেই উল্লিখিত কথাগুলি বল্লাম। সেই কারণে, মানে তাঁর ক্ষমতার ওপর আস্থা না থাকায়, "রূপলেখা" দেখতে গিয়েছিলাম বিশেষ আশান্বিত চিত্তে নয়—মনে দারুণ সংশয় ছিল। কিন্তু এখন বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের মনের সে-সংশয় সবিস্ময় আনন্দে পরিণত হয়েছে—"রূপলেখা" দেখে যে তৃপ্তি পেয়েছি, তা অনির্ব্বচনীয়! ছবিখানি সত্যিই এতো ভালো হয়েছে।

*

কাব্যের মতো করুণ মধুর যে গল্পটিকে কেন্দ্র ক'রে এই ছবিখানি রূপলাভ করেছে, তা হচ্ছে সংক্ষেপ এই—

মহারাজ অশোকের রাজত্বকালে সংসারের কর্ম্মচাঞ্চল্য হ'তে দূরে পাহাড়-ঘেরা ছোট এক গ্রামে থাকতো একটী মেয়ে! সুলেখা তার নাম, সংসারে ছিল তার মা। আর ছিল তার বন্ধু এবং সাথী—অরূপ! রাখাল ছেলে অরূপ সুলেখা-কে অন্তরের নিকটতম সম্পদ ব'লে মনে করত।

সুলেখার মা চাইতো, সুলেখা কোন বড় লোককে বি'য়ে ক'রে দাসদাসী ঘেরা প্রাসাদে বাস ক'রে বিলাসিতার মধ্যে জীবন যাপন করুক। প্রায় সেই উদ্দেশ্যে সে রাজবাড়ীতে কায যোগাড় ক'রে সুলেখাকে সেখানে নিয়ে গেল—অরূপ তাকে ধ'রে রাখতে পারলে না। যাবার বেলায় সুলেখা তার করুণ কাকুতি জানিয়ে গেল অরূপের কাছে—অরূপ যেন রাজবাড়ীতে কাযের যোগাড় ক'রে, নৈলে সুলেখাকে বিপদের সময় সাহায্য করবে কে?

*

মহারাজ অশোকের রাজপ্রাসাদ। নায়ক উশীনর মহারাজের পার্শ্বচর—অসচ্চরিত্র কুচক্রী আর বিশ্বাসঘাতক। তারই সঙ্গে সুলেখার মা সুলেখার বিবাহ দেবার ব্যবস্থা করলে।

অরূপ রাজ-কর্ম্মচারীর পদ পেয়ে রাজবাড়ীতে এসে দিন কাটাতে লাগলো।

একদিন মহারাজ অশোক মৃগয়ায় গিয়ে পথ হারালেন। গভীর রাত্রে পথহারা মহারাজ বনের মধ্যে এক কুটীর দেখে তার দ্বারে গিয়ে ডাক দিলেন—"কে আছো? দ্বার খোল।"

দ্বার খুলে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ বেরিয়ে এলেন। অশোক বল্লেন—আমি মহারাজ অশোকের কর্ম্মচারী। পথ হারিয়েছি। আশ্রয় চাই।

ব্রাহ্মণ বল্লে—মহারাজ অশোকের কর্ম্মচারীকে আমি আশ্রয় দিই না। কারণ, মহারাজ অশোকের রাজত্ব পাপের রাজত্ব; বিলাস আর স্বেচ্ছাচারীতার উন্মুক্ত লীলা-ক্ষেত্র।

*

কয়েকদিন পরে অমাত্য-পরিবৃত রাজা অশোকের সামনে সেই ব্রাহ্মণকে শৃঙ্খলিত ক'রে আনা হ'ল। কিন্তু ব্রাহ্মণের পরিবর্ত্তে অশোক-ই শেষ পর্য্যন্ত মাথা নীচু করলেন।

অশোকের অনুরোধে ব্রাহ্মণ মহেশ্বর একবৎসরের জন্য রাজ্যভার গ্রহণ করলেন। রাজ্যে শান্তি ফিরে এলো, ন্যায়ের বিধান পুনসংস্থাপিত হ'ল।

*

কিন্তু সেই শান্তি ও শৃঙ্খলার অন্তরালে উশীনর যে চক্রান্ত করলে তা যেমন ভয়ঙ্কর তেমনি নিষ্ঠুর। সে প্রথমে সুলেখাকে ধ'রে এনে লাঞ্ছিত করলো তারপর সেই রাত্রিতে রাজা অশোককে হত্যা করবার আয়োজন করলো।

কিন্তু তার আয়োজন সফল হ'ল না। তৎপরিবর্ত্তে পরদিন প্রাতে নগরদ্বারে উশীনরের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গেল। তার পাশে যে ছুরিকা রয়েছে, সে ছুরি অরূপের!

হত্যার অপরাধে মহেশ্বর অরূপের বিচার ক'রে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। পরদিন প্রাতে তাকে জীবন্ত দগ্ধ করা হবে—এইরূপ ব্যবস্থা হ'ল।

তারপর এক অভিনব সহজ ও সুন্দর উপায়ে এই চিত্তাকর্ষক গল্পের পরিসমাপ্তি ঘট্‌লো।

*

"রূপলেখার" ভূমিকাগুলি এইভাবে বিতরিত হয়েছে!

"সুলেখা"—শ্রীমতী উমা। "অরূপ"—প্রমথেশ বড়ুয়া। "অশোক"—অহীন্দ্র চৌধুরী। "মহেশ্বর"—মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য। "উশীনর"—বিশ্বনাথ ভাদুড়ী।

*

"রূপ লেখার" মধ্যে যে রসবস্তু প্রবাহিত তার মধ্যে মানবমনের চিরন্তন সুরের রেশ শোনা গিয়েছে; সেই কারণে তার ঝঙ্কার দর্শকদের মনের তারে ঘা দিতে সক্ষম হয়েছে। ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট সত্ত্বেও যে কয়টী টাইপ চরিত্রের সহায়তায় "রূপলেখার" কাহিনী মনোরম হ'য়ে উঠেছে তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের নিবিড় পরিচয় আছে; গুরুভার ক্লিষ্ট মহারাজের অন্তর্বেদনায় আমরা তাঁকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করছি; কর্ত্তব্য-কঠোর ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণের দৃপ্ত তেজে অভিভূত হয়েছি; কুচক্রী

লম্পট নায়ক-কে ধিক্কার দিয়েছি, এবং সেই সুকুমার রাখাল বালকটিকে দিয়েছি আমাদের অন্তরের অনন্ত প্রীতি।

"রূপলেখার" গল্পটি আমাদের অত্যন্ত আরাম দিয়েছে। চর্ব্বিত চর্ব্বণের উক্তা এর মধ্যে নেই—পরিচিত জনের তাগ জীবন্ত মনের আনন্দ-বেদনার ইতিহাস্ তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। "রূপলেখার" গল্পের মধ্যে পেয়েছি বুদ্ধির আভাস। গল্পটি আমাদের মানসিক রসলোককে উদ্বুদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছে।

"রূপলেখা-কে" সার্থক ছবি ক'রে তোলার কাজে তার অভিনেতৃদের অংশও কম নয়।

"অশোক" চরিত্রের যে সমাহিত ও মর্য্যাদা-দীপ্ত অভিব্যক্তি দেখিছি, তার জন্য অহীন্দ্র বাবুকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করি। "অশোকের" অন্তর্নিহিত ট্র্যাজিডি-টুকু তাঁর চোক-মুখে চমৎকার ফুটে উঠেছিল,—অহীন্দ্র বাবুর "অশোক" ছায়াচিত্রে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি তো বটেই, এ পর্য্যন্ত যত অভিনয় দেখেছি তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

"অশোকের" সঙ্গে সমতালে পা ফেলে সমান মর্য্যাদা এবং সংযমের সঙ্গে মনোরঞ্জন বাবুর "মহেশ্বর" অভিনীত হয়েছে। মনোরঞ্জন বাবুর অভিনয়ে অন্তর্মুখী তেজের দীপ্ত প্রকাশ দেখে মুগ্ধ হয়েছি। রঙ্গমঞ্চের মতো ছায়াচিত্রেও এই সংযমী ও শক্তিমান নট আপন বিশিষ্ট স্থান পাকা করেছেন।

বিশ্বনাথ ভাদুড়ীর "উশীনর" বাচনে ও মুখভঙ্গীতে অনিন্দনীয়! এই কঠিন ভূমিকাটিকে যথাযোগ্য ভাবে রূপায়িত করা সহজ কাজ ছিল না; বিশ্বনাথ বাবু বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে সে কাজ সমাপন করেছেন।

প্রমথেশ বড়ুয়ার অভিনয়ের মধ্যে একটি সুকুমার শ্রী আগাগোড়া তাঁর ভূমিকাটিকে মহিমামণ্ডিত করেছে। তাঁর উচ্চারণ-ভঙ্গী যদিও সব সময়ে আমাদের কাণে সমান ভালো লাগে নি, তাহলেও তাঁর অভিনয় সর্ব্বতোভাবে আমাদের তৃপ্তিদান করতে সক্ষম হয়েছে।

শ্রীমতী উমা "রূপলেখায়" নায়িকার ভূমিকা নিয়েছেন। শুধু নায়িকার ভূমিকা বল্লেই যথেষ্ট বলা হল না—এই ছবিতে তাঁর ভূমিকাটিই সব থেকে বড়—গানে এবং অভিনয়ে শ্রীমতী উমাকে বেশীর ভাগ সময়েই ক্যামেরার সামনে উপস্থিত থাকতে হয়েছে।

কয়েক সপ্তাহ আগে "হিন্দি চণ্ডীদাস" দেখে এই অভিনেত্রীটির সম্বন্ধে যে-কথা বলেছিলাম, আজ আবার সেই কথাটারই পুনরুক্তি করতে ইচ্ছা করছে—সত্যিই শ্রীমতী উমার জোড়া অভিনেত্রী বাঙলা দেশে তো নেই, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে খুব বেশী আছে কিনা সন্দেহ। বাঙলা দেশের মধ্যে শ্রীমতী উমাই বোধ করি একমাত্র অভিনেত্রী যিনি তাঁর ভূমিকাটিকে নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের দ্বারা ভাব এবং রস-সমৃদ্ধ করতে

পারেন। শ্রীমতী উমা তাঁর অভিনয়ের মধ্যে আগাগোড়া এমন একটি standard রক্ষা করেন, যা বিশেষ শক্তির পরিচায়ক! তাঁর অভিনয়ের বিশেষত্ব করুণ রসের মধ্যেই সমধিক ফুটে ওঠে।

শ্রীমতী উমার অভিনয়-শক্তি এবং শ্রীমতী রতন বাঈয়ের দেহ-সৌষ্ঠব — যদি কোন অভিনেত্রীর মধ্যে এই দুটো বস্তুর একত্র সমাবেশ দেখতে পাই, তাহলে তাঁকে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্রাভিনেত্রী ব'লে অভিনন্দিত করা যায় কিনা, সে-বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করব।

*

"রূপলেখার" মধ্যে আলো ছায়ার নিপুণ সমন্বয় চক্ষুকে তৃপ্তি দিয়েছে। ইউসুফ মুলজী সাহেবকে সেলাম জানাচ্ছি। প্রথম shilbontle এবং আর-ও দু-একটি Long Shot চমৎকার! "রূপলেখার" ফোটোগ্রাফীর মধ্যে আগাগোড়া যে একটি নরম tone ছিল সেটি ভারী উপভোগ্য হয়েছিল।

রাইবাবুর নেপথ্য-সঙ্গীত ভালোই। এ-বিষয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন।

"রূপলেখার" টেকনিক্যাল উৎকর্ষ-ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। Shotগুলির mixing উচ্চ শ্রেণীর নিপুণতার পরিচয় দিয়েছে। ক্যামেরার কাজ এবং ধারারক্ষীর কাজ-এর গুণে ছবিখানির মধ্যে আগাগোড়া একটি অখণ্ড সুর সঞ্চারিত হয়েছে।

*

"রূপলেখা" যে ধরণের ছবি এবং তার মধ্যে যে রসবস্তু প্রবাহিত হয়েছে, তাতে সে-ছবি হয় ভালো-ভাবে উৎরে যায়, নয় তো একেবারে যায় নিস্ফল হ'য়ে। "নিউ থিয়েটার্সে'র" সংগঠনকারীগণের কর্ম্মকুশলতায় "রূপলেখা" অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে; তার রস দানা বাঁধবার প্রচুর অবকাশ পেয়েছে এবং তার সমগ্র রূপটি দর্শকদের মর্ম্মস্পর্শ করেছে।

শুধু একটু ক্ষোভ আমাদের আছে এর ঐতিহাসিক back ground সম্পর্কে! এর মধ্যে যে রাজাকে খাড়া করা হয়েছে, সে-রাজা অশোক না হ'য়ে অন্য কেউ হ'লেই তো পারতো। "অশোক"-কে দাঁড় করিয়ে চিত্রনাট্যকার ইতিহাসের দায়িত্ব কাঁধে নিতে গেলেন কেন? তাঁর জানা উচিৎ ছিল, "অশোকের" নামের সঙ্গে আমাদের মনে যে ছবি জেগে ওঠে, তাকে যথাযথভাবে বজায় করতে পারলেই তবে আমাদের ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা মিটবে। "রূপলেখা"-র অশোক এবং তার সময়কার ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা বোধ হয় ঠিকমতো ইতিহাসের মর্য্যাদা রাখতে পারে নি।

কিন্তু সে-ত্রুটি নিতান্তই সামান্য। নিউ থিয়েটার্স-এর নব-অবদান "রূপলেখা" সর্ব্বদিক দিয়ে একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। আমরা অসঙ্কোচে আমাদের পাঠকবর্গকে ছবিখানি দেখে আসতে অনুরোধ করতে পারি।

হলিউড্ গল্পিকা ঃ—

ওদেশের চিত্রজগতের কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য লিপিবদ্ধ করা গেল ঃ

ইংলণ্ডের সাম্রাজ্ঞী একবার একটি ছবিতে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। সত্যি কথা। ছবিটির নাম—Women who sin! Women's Service League-এর উদ্যোগে ছবিটি তোলা হয়েছিল। তাতে কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে দেখা গিয়েছিল রাজ্ঞী মেরি একটি শ্রমিকের সঙ্গে বাক্যালাপ করছেন।

প্রথম যুদ্ধের ছবি দেখানো হয়েছিল ১৯০৫ সালে। নাম—Battle Cry of Peace! নর্ম্মা ট্যালমেজ নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন।

প্রথম ষ্টেজ-অভিনেত্রী যিনি ছায়াচিত্রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন, তাঁর নাম সারা বার্ণাহড্! ছবির নাম—Queen Elizabeth! ১৯১২ সালে ১২ই

জুলাই নিউইয়র্কের লাইসীয়াম থিয়েটারে ছবিখানি দেখানো হয়েছিল।

সমুদ্রের তলায় প্রথম যে ছবির দৃশ্য ক্যামেরায় গ্রহণ করা হয় তার নাম Twenty Thousand Leagues under the Sea! একটি সাবমেরিনের পর্য্যবেক্ষণ-যন্ত্রকে আলোকশিল্পীর কাজে লাগানো হয়েছিল।

১৯০৯ সালে প্রথম জঙ্গলের ছবি তোলা হয়। নাম, Big Game hunting in Africa! ছবির মধ্যে একটি রচনা-করা বনের মধ্যে পোষা সিংহ নামানো হয়েছিল। আফ্রিকার লোকেরাও ছবিখানিকে সত্যি জঙ্গলে-তোলা ব'লে বিশ্বাস করেছিল।

ভিটাগ্রাফ কোম্পানী সর্ব্বপ্রথম সেক্সপীয়রের নাটক ছায়াচিত্রে রূপান্তরিত করেন। ১৯০২ সালে "ওথেলো" এবং পরের বছর "রোমিও-জুলিয়েট" আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ছায়াচিত্রে প্রথম চুম্বন দেখানো হয় ১৮৯৬ সালে The widow Jones নামক ছবিতে। মে আরউইন ও জন রাইস্ নামে অভিনেতৃদ্বয় সেই সুমধুর কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন।

ফরাসীদেশে সর্ব্বসাধারণের কাছে সর্ব্বপ্রথম ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয় ১৮৯৫ সালের ২৫শে ডিসেম্বর!

ইংরাজী "It" শব্দটা হলিউডের একটি বিখ্যাত অর্থজ্ঞাপক কথা। এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন, লেখিকা Elinor Glyn! অভিনেত্রী ক্লারা বো-র ব্যক্তিত্বকে বর্ণনা করবার জন্যে এই শব্দের ব্যবহার করেছিল। কথাটির অর্থ যখন লেখিকাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল তখন তিনি বল্লেন—The indefinable something!

বিখ্যাত মর্ম্মর মূর্ত্তি ভিনাস ডি মেলোর দেহের গঠনের সঙ্গে কোন অভিনেত্রীর দেহের সব চেয়ে বেশী সাদৃশ্য আছে জানেন?—জোয়ান ক্রফোর্ডের।

জাপানী অভিনেত্রী আনা মে ওয়াং ছবির পর্দ্দায় কখনো চুম্বিত হন নি। আশ্চর্য্য বটে!

ডাক্তার জেকিল ও মিঃ হাইড ছবিতে ফ্রেড্রিক মার্চ্চ রূপসজ্জার জন্য প্রত্যহ পাঁচঘণ্টা করে সময় নিতেন। ছবিখানি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই বলবেন পাঁচ ঘণ্টা সময় নেবার মতোই make-up বটে।

আমেরিকার চলচ্চিত্রে-ব্যবসায়ে তিন লক্ষ লোক নিয়মিত অর্থ উপার্জ্জন করে।

*

আমাদের দেশের চিত্রপ্রিয়দের ভালো লাগবে এমন দুখানি ছবি শীঘ্রই এদেশে আসবে। তাদের নাম, Son of Kong এবং The Cat and the Fiddle।

রেডিও কোম্পানী Son of Kong এর নাম দিয়েছেন—a Serio Comic Fantasy!

এ ছবিতেও কার্ল্ ডেনহাম আছেন। তাঁকে নিয়েই এ-গল্পের সুরু। এক সার্কাস ওয়ালার মেয়ের সঙ্গে ডেনহামের পরিচয় হয়, তারপর তারা দুজনে শত্রুদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে লোকালয় থেকে পলায়ন করে!

এক ভীষণ বনের মধ্যে কার্ল্ ও হিলডা কং-এর একটা শিশু-সংস্করণ এর সাক্ষাৎ পায়! সেই জানোয়ারটি শেষ পর্য্যন্ত তাদের হত্যা না ক'রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে।

এই ছবিতেও একাধিক প্রাগ্‌ঐতিহাসিক জীবজন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া

যায়। রবার্ট আর্মষ্ট্রং এ-ছবিতেও কার্ল্ ডেনহামের ভূমিকায় দেখা দিয়েছেন। নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়েছেন—হেলেন ম্যাক। হেলেন এই ছবিতে অতি সুন্দর অভিনয় করেছে।

The Cat & The Fiddle-এ নায়ক-নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন—র‍্যামন নোভারো এবং জেনেট ম্যাকডোনাল্ড। তাঁরা দুজনে এই প্রথম এক ছবিতে এক সঙ্গে নামছেন। ছবির মধ্যে কয়েকটি চমৎকার technicolour দৃশ্য আছে।

এই ছবিতে একটি লোকের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য হয়েছে। তার নাম চার্লস বাটারওয়ার্থ্। প্রকৃত পক্ষে চার্লসের অভিনয় সব-চেয়ে উপভোগ্য হয়েছে। বল্লেও অত্যুক্তি হয় না।

র‍্যামন এবং জেনেটের অভিনয়-ও যারপরনাই তৃপ্তিদায়ক হয়েছে। তাদের গানগুলি টিকিটের দাম পুষিয়ে দেবে। জীন হারশল্ট, হেনরি আরমেটা ও ষ্টর্লিং হলোয়ের নামও উল্লেখযোগ্য।

*

য়্যাকাডেমি অফ মোশান পিকচার্স আর্টস এণ্ড সায়ান্স ১৯৩৩ সালের সেরা ছবি ও সেরা অভিনেতা-অভিনেত্রী সম্বন্ধে তাদের মতামত প্রকাশ করেছেন। নীচে তার বিবরণ দেওয়া গেল—

অভিনেত্রী—ক্যাথারিণ হেপ্‌বার্ন্ (মর্নিং গ্লোরি)

অভিনেতা—চার্ল্‌স্ লাফটন্ (প্রাইভেট্ লাইফ অফ হেনরি দি এইট্থ্)

শ্রেষ্ঠছবি—ক্যাভালকেড্ (ফক্স্)

পরিচালনা—ফ্র্যাঙ্ক লয়েড্ (ক্যাভালকেড্)

কারু সজ্জা পরিচালনা—উইলিয়াম ডার্লিং (ক্যাভালকেড্)

৬

The Wandering Jew একখানি উঁচুদরের ছবি। কালথেকে স্থানীয় এলফিনষ্টোনে দেখানো হবে। বাইবেলের একটি করুণ কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে এই ছবিটির গল্পাংশ রচিত হয়েছে। সাধারণতঃ, যে ধরণের ছবি আমরা দেখি, উক্ত ছবিখানির মধ্যে তাদের থেকে পার্থক্য তো আছেই, উপরন্তু এই ছবির মধ্যে কনরেড ভেড যে উচ্চশ্রেণীর অভিনয়-শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, সচরাচর তেমনতরো সূক্ষ্ম কলাসম্মত অভিব্যক্তি নজরে পড়ে না। তাঁর সম্বন্ধে লেখা হয়েছে—The story which concerns a man who is condemned to wander the earth for centuries as a punishment for insolence to his master, covers a span of something like sixteen hundred years of history and Conrad Veidt's performance in the title role is said to have excelled anything that this great international artiste has ever done !

———

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয়ঃ—

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩৯।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

ডাকঘর

(১)

সাহিত্যিক বৃহন্নলা

গত বৃহস্পতিবার বাঙলার তথাকথিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক কাগজে উক্ত ছদ্মনামে যে ব্যক্তি আনন্দ পরিষদের "রূপেশের স্ত্রী" অভিনয় সম্পর্কে সুদীর্ঘ মতামত প্রকাশ করিয়া নিজের অসীম বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। রচনার সহিত ছদ্মনামের এরূপ সামঞ্জস্য ইহার পূর্ব্বে আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। লেখক নিশ্চয়ই কোন নব্যতন্ত্রের লোক; সুতরাং নারীপদসেবী স্ত্রীপরাজিত নব্যতন্ত্রের উপর কোনরূপ কটাক্ষ অতি সহজেই তাঁহার মনকে বিদ্ধ ও মগজকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তিনি একস্থলে বলিতেছেন, "স্ত্রী-বর্জ্জিত বাগানবাড়ীতে একজন অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুর নিমন্ত্রণে এতগুলি শিক্ষিতা ভদ্র-যুবতীদের সমাগম বাঙলায় কেন, যে বিলাতী অনুকরণে এখন আমরা সভ্য সেই বিলাতী সমাজেও হয় না। আর শুধু সমাগম নয়, বাগান বাড়ীতে সমাগম, সেখানে নৃত্যবাদ্যগানে মধ্যরাত্রি "(অর্থাৎ, রাত্রি দশটা)" পর্য্যন্ত অতিবাহন, একেবারে হাস্যকর, অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব।" অয়ি বৃহন্নলে! তুমি আরও কিছুকাল অজ্ঞাতবাসে থাকিলে ভাল করিতে, সাহিত্যের ও অভিনয়ের আসরে নামিয়া মুক্ত দিবালোকে সভায় সমিতিতে অথবা আলোকোজ্জ্বল পাদপীঠের সম্মুখে আলোকপ্রাপ্তাদের এতাদৃশী দুর্দ্দশা তোমায় দেখিতে হইত না।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় অমৃতলালের কথা মনে পড়িয়া গেল। 'খাসদখল' অভিনয়ের পর কোন বিশিষ্ট নব্যতান্ত্রিক তাঁহাকে ঐ রঙ্গনাট্য খানির অভিনয় বন্ধ করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করেন। উত্তরে নাট্যকার বলিয়াছিলেন, "অভিনয় না হয় বন্ধ করলাম কিন্তু ইংরাজী শিক্ষার ফলে ঘরে ঘরে যেদিন এই অভিনয় সুরু হবে সেদিন তাকে ঠেকাবে কি দিয়ে?" হেছুয়ার রুচিবাগীশ ক্রিটিককে আমরা অনুরূপ একটি প্রশ্ন করতে চাই।—বাগানবাড়ীর অভিজ্ঞতা লাভ করিবার সুযোগ তাহার হয়তো মিলে নাই, কিন্তু লেক, বালিগঞ্জ, গড়ের মাঠ ও ইডেন গার্ডেন প্রভৃতি অঞ্চলেও তিনি কি কখনও যান নাই? যাইলে আধুনিকা তরুণীদের "স্বাধীনতা" যে কতদূর পৌছিয়াছে যে সম্বন্ধে তাঁহার কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে বিলম্ব হইবে না।

অনুসন্ধানে জানা গেল আমাদের স্বনামধন্য সাহিত্যক ধুরন্ধরটি একজন versatile genius, উপন্যাসে নাটকে কাব্যে ও সমালোচনায় তাঁহার সমান অধিকার। তাঁহার উপন্যাস ও কাব্য যে কি উপাদানে প্রস্তুত তৎসম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল মিটিয়াছে তাঁহার নাটক পড়িয়া। বিশেষ পরিচয়ের জন্য 'নবশক্তি'র 'চন্দ্রশেখর' লিখিত সমালোচনা দ্রষ্টব্য। এহেন ভূঁইফোড় সাহিত্যিক কুলচূড়ামণি যে অন্যের সাহিত্য-সৃষ্টিকে হীনচক্ষে দেখিবেন তাহা আর বিচিত্র কি? "রূপেশের স্ত্রী"র নাট্যকারকে উদ্দেশ করিয়া তিনি একস্থলে লিখিয়াছেন "লেখা তাঁহার পথ নয়; এ পথে অনধিকার প্রবেশ করিয়া তিনি বিপদকেই আমন্ত্রণ করিয়াছেন। * * * তিনি লেখার খিচিমিচিতে না গেলেই ভাল হয়।" সত্যকথা, লক্ষ্মীবাবু তো কোন ছাপাখানার মালিক বা পরিচালক নন, সুতরাং তাঁহার পক্ষে নাট্যকারের সম্মানলাভ করা সহজসাধ্য হইবে কি করিয়া? শুধু তাই নয়, তাঁহার পক্ষে এ কল্পনাও মহাপাপ।

রচনার দুর্ব্বলতা, এলোমেলো ঘটনা সংস্থাপন, একঘেয়ে নীরস সংলাপে নাটকের গতি ও ঘাত প্রতিঘাতের পদে পদে ব্যাঘাত, মঞ্চরচনায় পঞ্চায় মিনিটকাল বিলম্ব, পাঁচটি পুরুষ চরিত্রের ভিতর মাত্র একজনের আভিনয়িক পূর্ণ সাফল্য এবং অপর একজনের আংশিক সাফল্য, এ সব সত্বেও অভিনয় হইয়াছে একেবারে প্রথম শ্রেণীর, শোভন, সুচারু ও সুন্দর। বৎস রে! কি আর বলিব আমি। ইচ্ছা করে তোমাকে লইয়া বিরাগী হইয়া যাই।

'রূপেশের স্ত্রী'র নাট্যকারকে আক্রমণ করিয়াই বৃহন্নলা ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার স্বভাবসুলভ অপুরুষোচিত কটাক্ষ 'কল্পতরু'র পক্ষে তারকবাবুর নাট্যরচনা ও অভিনয়ের উপরও পড়িয়াছে। তাই তিনি 'রূপেশের স্ত্রী' অভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে 'ধান ভাঙ্গিতে শিবের গীত' গাহিয়াছেন। "এই তারকবাবু হেনারূপে এখানে যেমন সাবলীল সহজ ও সুন্দর অভিনয় করিলেন এমনটীতো তিনি কল্পতরুতে করিতে পারেন নাই! বোধ হয় সেখানে ইনিও নাট্যকার হইয়া অভিনয়ে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। * * * মধ্যে কেবল কল্পতরুতে গিয়াই তারকবাবু একটু প্রভাহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কেশ নখ ও দন্ত স্থান-চ্যুত হইলেই অপবিত্র হয়, নটনটীও হয়।" "উপমা কালিদাসস্য" কথাটি এরূপরে খুব সাবধানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। বাঙলার উর্ব্বর সাহিত্য ক্ষেত্রে দোফলা কালিদাস জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নিছক হিংসা বৃত্তি লইয়া দলাদলি বাধাইবার স্পৃহা ও ছাপাখানা প্রসাদাৎ সাহিত্যের আসর সরগরম করিবার চেষ্টা তাঁহার সমধিক প্রশংসনীয়। সিদ্ধেশ্বর পাইন এই শেষোক্ত তথ্য অবগত ছিলেন না, জানিলে তিনিও একজন উচ্চাঙ্গের সাহিত্যিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন।

'কল্পতরু'তে অভিনীত তারকবাবুর 'পারের আলো' নাটকখানি কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, কল্পতরুতে তাঁহার অভিনয় প্রভাহীন কি শোভাহীন সে সম্বন্ধে হেভুয়ার বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মগজ পরিচালনা না করিলেও চলিত। এ সম্বন্ধে 'চন্দ্রশেখর', 'শ্রী' প্রভৃতি সর্ব্বজনগ্রাহ্য সমালোচকগণ 'নবশক্তি', 'Liberty', বাতায়ন' ও 'বাঙ্গলার বাণী' পত্রিকায় যে সমস্ত অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এমন কি "বিচিত্রা" সম্পাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ও মনস্তত্ত্বের ঋষি স্বয়ং শরৎচন্দ্র পর্য্যন্ত যেরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন তৎপ্রতি আমরা তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করি। কিন্তু ইহাতে ফলই বা কি হইবে! অন্ধ জাগো—কিবা রাত্র কিবা দিন।

"ইন্দ্র"

(শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)

---

(২)

পঞ্চপ্রদীপ সম্মিলনীর জলসা ও সন্দিগ্ধ অভিনয়।

গেল ১৫ই এপ্রিল রবিবার ইউনিভার্সিটি ইনিষ্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে পঞ্চপ্রদীপ সম্মিলনী বিহার ভূমিকম্পের সাহায্যের জন্য জলসা ও অভিনয় আয়োজন করেছিলেন। দুঃখের সঙ্গে জানাতে বাধ্য হচ্ছি যে তাঁদের জলসার আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। যে সমস্ত শিল্পীদের নাম প্রচার করেছিলেন তাঁদের মধ্যে দু'একজন ছাড়া সকলেই কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হননি। অনুসন্ধানে জানা গেল তাঁরা প্রত্যেকেই আসবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এ ব্যাপার এই প্রথম নয়—প্রায়ই এরকম হয়ে আসছে—আর এজন্য দর্শকরা ভ্রান্ত হয়ে তাঁদের পয়সা নষ্ট করছেন ও উদ্যোগকারীরা মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হচ্ছেন—কিন্তু আমরা আশ্চর্য্য হই যে শিল্পীরা কেন তাঁদের নামের কোন মর্য্যাদা আছে বলে মনে করেন না? তাঁদের নামে ভ্রান্ত হয়ে প্রায়ই যে দর্শকরা নিরাশ হচ্ছেন, একথা কি তাঁরা কখনও ভাবেন না? আর উদ্যোগকারীরাও যেন ভবিষ্যতে শিল্পীদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার আগে তাঁদের এই মূল্যহীন নাম প্রচার করে দর্শকদের ভ্রান্ত হবার সুযোগ দিয়ে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন না হন।

তারপর অভিনয়ের কথা:—শ্রীশবাবুর "সন্দিগ্ধার" রঙ্গমঞ্চে অভিনয় এই প্রথম। বিখ্যাত লেখিকা মিসেস্ হেন্‌রী উডের "ইষ্ট্ লিনের' ছায়া অবলম্বনে হিন্দু সমাজ সঙ্গত করে বইখানির রচনা। সন্দেহবহ্নি দাবাগ্নির মত কি ভাবে সুখের সংসার ভস্মীভূত করে বইখানি তারই একটী দৃষ্টান্ত। অভিনয়ের মধ্যে শ্রীযুক্ত মণিলাল ব্রহ্ম "সত্যেনে"র ভূমিকায় সম্পূর্ণ মর্য্যাদা রক্ষা না করলেও, তাঁর অভিনয় নিন্দনীয় হয়নি—তবে বিলাত ফেরত উচ্চশিক্ষিত ব্যারিষ্টারের ভাব তাঁর অভিনয়ে প্রকাশ পায়নি। "নলিনী"রূপে জগমোহন মুখোপাধ্যায় সকল দিক দিয়ে তাঁর সুনাম বজায় রেখেছেন। ললিত চক্রবর্ত্তী সাধ্যমত তাঁর "যোগেন"রূপী পলাতক আসামীর রূপ দিতে কার্পণ্য করেন নি। বৃদ্ধ বিশ্বনাথের অপত্যস্নেহ শৈলেন বসুর হাবভাবে আর একটু প্রকাশ পেলে ভাল হত। স্ত্রী-ভূমিকার মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছেন "অমিয়া"র ভূমিকায় নলীন্দ্র দেব। "ইন্দুর" ভূমিকায় জ্যোতিপ্রকাশ বর্ম্মণ অভিনয় ভালই করেছেন কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর দর্শকদের মোটেই সন্তুষ্ট করতে পারেনি। "রমণী" চরিত্রটীকে বেশভূষায় অত সৌখীন না করলে ভাল হত। ক্ষুদ্র ভূমিকায় বিরাজ খুব ভালই অভিনয় করেছেন। ভৃত্যের ভূমিকায় অমল রায়ের অভিনয় বেশ ভালই হয়েছে। মোটের উপর পঞ্চপ্রদীপের অভিনয় আয়োজন সেদিন মোটেই নিন্দনীয় হয়নি। সর্ব্বশেষে তাঁদের প্রেক্ষাগৃহ পরিচালনার দোষে দর্শকদের বিশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হয়েছে। ইতি—

শ্রীতারাপদ ঘোষ।

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা]   Regd. No. 1304.   [বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৩শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

১৪ই বৈশাখ
১৩৪১

কলালাপ

বিশ-পঁচিশ বৎসর! যে-কোন একজন মানুষের জীবনের পক্ষে তার মহিমা বড় অল্প না, কিন্তু একটা বৃহৎ জাতির জীবনে তা মহাকালের চক্ষের একটিমাত্র পলক বলতেও বাধ্‌বে।

*

বাংলার কাব্য-সাহিত্যে বিশ-পঁচিশ বৎসর আগেকার কথাই স্মরণ করুন। বাংলার কাব্য-কুঞ্জে তখন একসঙ্গে উচ্চশ্রেণীর কত কবির বীণার আলাপ শোনা যেত! রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, দ্বিজেন্দ্রলাল, গোবিন্দদাস, সত্যেন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান প্রভৃতি। নাম করলে আরো অনেকের করা যায়। ভালো মহিলা-কবিও গুণ্‌তিতে বড় কম ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে তখন একসঙ্গে যে-সব কবিতা বেরুতো, যে-কোন দেশের যে-কোন জাতির পক্ষে তা গর্ব্ব ও গৌরবের কথা।

*

কিন্তু বাংলার বর্ত্তমান তরুণ সাহিত্য কাব্যের দিক দিয়ে বিশেষ কোন উচ্চতার দাবি করতে পারে না। উপর-উক্ত কবিদের প্রসাদেই বাংলা কাব্যের সাধারণ আদর্শ, ছন্দ ও বৈচিত্র্য অধিকতর উন্নত হয়েছে বটে, কিন্তু ওঁদের সঙ্গে তুলনীয় ভালো কবি ও কবিতার সংখ্যা বেড়েছে ব'লে মনে হয় না। কারিকুরি বেড়েছে, প্রজ্ঞা বা intellect এর পরিচয় বেশী পাওয়া যাচ্ছে, গঠনের দিকে নজর আরো তীক্ষ্ণ হয়েছে, কিন্তু ভাবসম্পদে বাংলা কবিতা যেন ক্রমেই দীন হয়ে পড়ছে। ফুলের সার্থকতা যেমন গন্ধে, কবিতারও সার্থকতা যে তেমনি ভাবে, এ পুরাণো কথাটা সবাই জানেন। অনেক নিরক্ষর মেঠো কবির কবিতা প'ড়ে দেখবেন। সেগুলির মধ্যে নিখুঁৎ গড়ন, শুদ্ধ মিল বা সুন্দর ছন্দ নেই, কিন্তু তবু তারা প্রাণ-মনকে অভিভূত ক'রে দেয় কেবল ভাবময় কবিত্বের মোহনীয় লীলায়। চণ্ডীদাসের চেয়ে গোবিন্দ দাসের পদাবলীতে গঠন, মিল ও ছন্দ বেশী উন্নত। কিন্তু তবু চণ্ডীদাস শ্রেষ্ঠতর কবি, কারণ ভাবের দিক দিয়ে তিনি টেক্কা মেরেছেন গোবিন্দ দাসের উপরে। ফরাসীদেশে একবার দুই বিখ্যাত রসিক কাব্য নিয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তর্ক যে আসল সত্যকে ঝাপসা ক'রে দেয়, এ সত্যটাও তাঁরা প্রমাণিত করতে বাকি রাখেন নি। Academie Francaise-এর সভ্য Abbe Bremon বললেন, খাঁটি কবিতা হবে অর্থহীন। তার মধ্যে থাক্‌বে ধ্বনি বা সঙ্গীত। Temps পত্রের সাহিত্য-সমালোচক Paul Souday প্রতিবাদ ক'রে বললেন—না, খাঁটি কবিতা হচ্ছে ("an expression of intellect") প্রজ্ঞা বা মনীষার অভিব্যক্তি মাত্র।... ... ... ঐ দুই ভদ্রলোক তর্কের খাতিরেই তর্ক করেছিলেন। নতুন কথা বলবার ব্যগ্রতায় আজকাল তর্কের খাতিরে তর্ক করেন অনেকেই এবং এইজন্যে সাহিত্যক্ষেত্রে জঞ্জালের স্তূপ ক্রমেই বেশী উঁচু হয়ে উঠছে। নতুন কথা শুনতে মন্দ লাগে না, কিন্তু এঁরা ভুলে যান, সত্য কেবল পুরাতন নয়, চিরন্তনও বটে?

মোশান পিকচার য়্যাকাডেমি কর্ত্তৃক ১৩৩৩ সালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে নির্ব্বাচিতা ক্যাথরিন্‌ হেপ্‌বার্ন

কাব্যে সঙ্গীত বা ধ্বনিরও দাম আছে এবং প্রজ্ঞার মূল্যও অল্পও নয়। কিন্তু ভাবহীন কবিতা,—যা অবাধ ও স্বাভাবিক প্রাণকে প্রকাশ করতে অপারগ, কোনদিনই কেবল ধ্বনির বা কেবল প্রজ্ঞার জন্যে বিশ্বসাহিত্যের শিরোমণি হ'তে পারবে না। কবি সুইনবার্ণ মিষ্ট কবিতার জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু তিনি অধিকতর মিষ্ট ব'লে কি সেলির চেয়ে বড় কবি? কবি অক্ষয়কুমার বড়াল কাব্যের মধ্যে প্রজ্ঞার প্রকাশ দেখাবার জন্যে যথেষ্ট চেষ্টাই করেছেন, কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন যা করেন নি—যদিও তাঁর নামের পিছনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রীর অভাব ছিল না। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ সেনকে কেউ অক্ষয়-কুমারের চেয়ে ছোট কবি বলে না, বড় কবি ব'লেই মনে করে।

*

আমাদের বিশ্বাস, বিদেশী ভাব এসে বাঙালীর কবিতাকে এখন বাংলার কবিতা হ'তে দিচ্ছে না। আজকালকার উল্লেখযোগ্য দু-একজন নবীন কবির লেখা যখন পড়ি তখন সন্দেহ হয়, বুঝি পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদই পড়ছি। প্রাচ্যের কবি যদি প্রতীচ্যের 'আবহ' সৃষ্টি করবার জন্যেই ব্যস্ত হন, তাহ'লে সে চেষ্টাকে কেউ স্বাভাবিক ব'লে মনে করবে না। এবং যা স্বাভাবিক নয়, তা ভালো কবিতাও নয়। ঐ পাশ্চাত্য দেশেই দেখবেন, ওখানকার বিভিন্ন দেশের কবিতার মধ্যে ভাব ও প্রকাশ ভঙ্গীর পার্থক্য কতটা! ফ্রান্স ও ইংলণ্ড পরস্পরের প্রতিবেশী। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কাব্য হচ্ছে পরস্পরের কাছে বিদেশী!

*

বাংলার বিপুলা গঙ্গানদীর স্রোতের ভিতরে আজ টেম্‌স্ ও সিন্ নদীর তরঙ্গ-কোলাহল শ্রবণ করছি। এ অসম্ভব সম্ভব করবার জন্যে যাঁরা কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছেন, আমরা তাঁদের কবি ব'লে মানতে রাজি নই।

*

ব্রহ্মদেশের নর্ত্তক-নর্ত্তকীরা এই হপ্তায় দৃশ্য-সঙ্গীতের ছন্দে আমাদের অন্তরে একটি নূতন আনন্দকে লীলায়িত করবেন। মানুষের দেহ যে রাগ-রাগিণীকে রেখার মত ব্যবহার করতে ও তাই দিয়ে ছবি আঁকতে পারে, ঐ নৃত্য-চিত্রকররা সেইটিই আমাদের দেখাবেন ও বোঝাবেন। ব্রহ্মদেশবাসী জনৈক সাহিত্যিক বন্ধুর (শ্রীযুক্ত সুবোধ চট্টোপাধ্যায়) মুখেও শুনলুম, এই নৃত্য-সম্প্রদায়টি ওখানে নাকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব'লেই সম্মান লাভ করে। সুতরাং এঁদের দেখতে গিয়ে যে মেকির অত্যাচার সইতে হবে না! এ সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হয়ে রইলুম।

*

"চিত্রা"র নতুন ছবি "রূপলেখা" দেখতে গিয়ে এই কথাগুলি আমাদের মনে হয়েছে: (১) সম্রাট অশোক বেচারীকে যিনি অকারণে এমনভাবে অস্থানে টেনে-হিঁচড়ে আনতে পারেন, তাঁকে নির্ব্বোধ বললেও অত্যুক্তি হবে না। "রঙ্ মহলে"র জাল অশোকের পরেই "রূপলেখা"র কিম্ভূতকিমাকার অশোক দেখে অবাক হয়ে গেলুম। সাজপোষাক বা ইতিহাস, এই দুইকেই এই চিত্রাশোক যেন সগৌরবে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে চেয়েছে! অথচ অশোক নামটিকে নিয়ে টানাটানি করবার কোন দরকার ছিল না। অশোকের বদলে যে কোন যুগের জনৈক কাল্পনিক রাজার নাম ব্যবহার করলে এই চিত্রনাট্যের কোনই ক্ষতি হ'ত না। (২) শ্রীমতী উমা দিনে দিনে ভগবানের ইচ্ছায় যে-রকম হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠছেন, তাতে মনে হয় চিত্র-জগতের তারকা-লোকে ওঁকে আর বেশীদিন বিচরণ করতে হবে না। এ ছবিতে তাঁকে মানায় নি। (৩) বিদেশী যে সব ছবিকে আমরা নিখুঁৎ ব'লে স্বীকার করি, তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে পারে এমন বাংলা ছবি দেখবার জন্যে আমাদের এখনো অনেক কাল সবুর করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশে যে তিন-চারখানি ছবি সব-চেয়ে ভালো ব'লে আদর পেয়েছে, অভিনয়ের, গল্প-বলার, পরিচালনার ও আলোক-চিত্রের দিক দিয়ে "রূপলেখা" তাদের কারুর চেয়েই খাটো হয়নি,—— এমন-কি কেউ যদি "রূপলেখা"কে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাংলা চিত্র বলেন, তাহ'লেও আমরা আপত্তি করব না। এজন্যে কুমার শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়াকে অভিনন্দন দেওয়া যায় অনায়াসেই। (৪) শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর চিত্রোপযোগী এত চমৎকার অভিনয় আর কোন ছবিতে দেখেছি ব'লে মনে হচ্ছে না।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

স্বপনে গোপনে শুনেচি তোমার আঁখির গীতি,
আমার ভুবনে এনেচ পূর্ণ-চাঁদের তিথি।

*

বুকে ছিল মোর যত বোবা আশা,
ভাষা পেলে আজ, পেলে ভালোবাসা,
তোমার গানেতে ভুলেচি অতীত ঘুমের স্মৃতি।

*

রূপোলী ওড়্না উড়িয়ে জোছ্না খেলে নদীতে,
ফুটিছে কলিকা সুরভির সুরা তোমাকে দিতে।

*

কোকিল কহিছে কবিতায় কথা,
সমীরের সুরে প্রেম-ব্যাকুলতা,
জেনেছে নিখিল, তুমি হ'লে মোর চির-অতিথি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

নাচঘর কার্য্যালয়ঃ —

১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন নং কলিকাতা ৩১৪৫

ব্যবসা সংক্রান্ত সমস্তচিঠিপত্র, টাকাকড়ি, বিজ্ঞাপন, ব্লক প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। নিমন্ত্রণ ও বিনিময়-পত্র এবং প্রবন্ধাদি ২৩৯।১ অপার চিৎপুর রোড, বাগবাজারে সম্পাদকের নিকট পাঠাইবেন।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ (সীতা হিন্দি) ঃ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম্

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা—দেবকী বসু
সঙ্গীত পরিচালনা—কৃষ্ণচন্দ্র দে
ফোটোগ্রাফী—যতীন দাস

ভূমিকালিপি বিতরিত হয়েছে এইভাবে—

সীতা শ্রীযুক্তা দুর্গাবাই খোটে ; রাম—পৃথ্বিরাজ ; বাল্মিকী—গোবিন্দরাম টাম্বে ; ধরিত্রী—মুক্তার বেগম ; কুশ—হীরালাল ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি ;

*

যতখানি আশান্বিত চিত্তে ছবিখানি দেখতে গিয়েছিলাম, দেবকী বাবুর "সীতা" আমাদের ঠিক ততখানি আশাপূর্ণ করতে পারেনি, কিন্তু এ-কথায় কেউ যেন না মনে করেন যে ছবিখানি আমাদের খারাপ লেগেছে। মোটেই না। সীতার গল্পটি অভিনব ভাবে সুন্দর ক'রে বলা হয়েছে এবং অভিনয়ের গুণে গল্পটির অন্তর্নিহিত ট্র্যাজিডির সুর যথার্থরূপে ফুটে উঠেছে। সেদিক থেকে দেবকী বাবু অকৃতকার্য্য হননি।

*

অন্য কারুর পরিচালনায় তোলা ছবি দেখতে যাওয়া এবং দেবকী বাবুর পরিচালনায় তোলা ছবি দেখতে যাওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে। দেবকী বাবুর কাছ থেকে আমরা কিছু বেশী আশা করি। এবং "সীতার" মধ্যে সে আশা আমাদের মেটেনি। এই ছবিতে তাঁর প্রতিভার এমন কোন স্ফুরণ দেখতে পেলাম না, যা স্মরণ করে রাখতে পারি। চিত্র-নাট্যখানির রচনা ভাল হয়েছে, পরিচালনা ভাল হয়েছে, অভিনয় ভাল হয়েছে—কিন্তু ঐ-পর্য্যন্ত। তার চেয়ে বেশী আর কিছু বলতে পারছি না।

*

সীতার জীবনের যে সময়টুকুকে নিয়ে দেবকীবাবু চিত্র-নাট্যখানি লিখেছেন, সে-সময়টুকু খুব বেশী নয় ; কাজে কাজেই চিত্রনাট্যখানির মধ্যে action-এর ভিতর অন্য এমন অনেক জিনিষ এসে পড়েছে যে-গুলি সব-সময় নাটকের গতিকে অব্যাহত রাখতে পারে নি। সময় অসময় এবং স্থানে-অস্থানে সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব আমাদের সব সময় আনন্দ দিতে পারেনি। ছবির আরম্ভটি মনে হ'ল যেন গানের দ্বারা অনাবশ্যক দীর্ঘ ক'রে তোলা হয়েছে। রামের art galleryর idea টি চমৎকার—যদিও এখানে উত্তররামচরিতের কথা মনে হয়। কিন্তু একজন ব'সে গান গাইছে এবং সেই অবকাশে ক্যামেরা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে set এর সৌন্দর্য্য display—এ idea অত্যন্ত পুরাণো। দেবকী বাবু এই পুরাণো টেক্‌নিকের আশ্রয় গ্রহণ না করলেই পারতেন।

*

'সীতার" নেপথ্য-সঙ্গীত পরিচালনা ক'রে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের অবিমিশ্র প্রশংসা পাবার অধিকারী হয়েছেন। বিশেষ ক'রে শেষের দিকে নেপথ্য-সঙ্গীত যে তীব্র আবহের সৃষ্টি করেছিল, তা সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। কৃষ্ণচন্দ্রের গানগুলিও আনন্দ দিয়েছে। ফোটোগ্রাফী ভালো হয়েছে। দু'-এক স্থানে সঙ্গতির অভাব লক্ষ্য না করলে আরও ভাল বলতে পারতাম।

*

অভিনয়ের মধ্যে সমালোচনায় প্রথমেই মনে পড়ছে লব্-এর কথা। অভিনেতার নামটি মনে পড়ছে না ; কিন্তু তাঁর সাবলীল এবং তেজোদীপ্ত অভিনয়টি বারবার মনে পড়েছে। রামের সঙ্গে অভিনয়ের সময় তাঁর চাপা-দৃপ্ত কণ্ঠের কথাগুলি এখনো কাণে আসছে। চীৎকার না করেও কেমন করে মনের প্রচণ্ড অভিমান প্রকাশ করা যায় এ-অভিনেতাটি তা বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত প্রমাণ করেছিলেন।

শ্রীযুক্তা খোটের মধ্যে যে ব্যক্তিত্ব, চার্ম্ ও ডিগ্‌নিটি আছে, তা তাঁর অভিনয়ে প্রভূত সাহায্য করেছিল। তাঁর সীতা অনিন্দ্যনীয়!

পৃথ্বিরাজের করুণ কোমল অভিব্যক্তি ভারি উপভোগ করেছি। তাঁর চলনে বলনে ছিল যেমন মর্য্যাদা, তেমনি দুঃখের ছাপ। তাঁর "রাম" আমাদের অনেকদিন মনে থাকবে।

আর-সব অভিনেতা-অভিনেত্রী যেমন হয় তেমনি——অতি-সাধারণ।

*

(২) **Bolero** (প্যারামাউণ্ট)

পরিচালনা—ওয়েস্‌লি রাগল্‌স্
প্রধান ভূমিকায়—জর্জ্জ র‍্যাফ্‌ট্ ও ক্যারল লম্বার্ড
কাল থেকে এলফিনষ্টোনে সুরু হবে।

*

Bolero-র মধ্যে মানব-চরিত্রের একটি বিশেষ দিক-কে অভিনব উপায়ে চিত্রিত করা হয়েছে। একটি নৃত্যকলাকুশলী যুবক নারীর সাহায্যকে ভর ক'রেই যশের চরম শিখরে উঠেছিল ; কিন্তু তা সত্বেও নারীর প্রতি মন তার নিবিড় ভাবে কোনদিন আকৃষ্ট হয় নি। তার সঙ্গে তার ছিল শুদ্ধমাত্র ব্যবসায়ের সম্পর্ক—শিল্পলোকে কেমন ক'রে সে অমরত্ব অর্জ্জন করবে, এই ছিল তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

*

প্রথমে যে মেয়েটি (তার নাম লেওনা) যুবকের নৃত্যসঙ্গিনী রূপে দেখা দিল সে বেশীদিন তার সঙ্গে no-sex সম্পর্ক বজায় রাখতে পারলে না ; ফলে যুবক তাকে পরিত্যাগ করলে। জীবনে দ্বিতীয়ার আবির্ভাব হ'ল—নাম হেলেন। অপরূপ তার লাবণ্য, অসামান্য তার প্রতিভা। যুবকের নাম খ্যাতির শেষ সীমানায় এসে উপস্থিত হ'ল। এবারে যুবক-ই নারীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ল—ব্যবসায়ের নীরস সম্বন্ধের ক্লান্তি ঘুচ্‌লো ; তাদের জীবনে সার্থকতার ফুল ফুট্‌লো। এই সময় দেশে এলো যুদ্ধের উত্তেজনা। যুবক তার নামের সপক্ষে শুদ্ধমাত্র publicity stunt দেবার জন্যে যুদ্ধে যোগদান করলে। তার আশা ছিল, যুদ্ধ এক সপ্তাহেই শেষ হবে।

*

কিন্তু তা হ'ল না। এদিকে হেলেন এক ধনী জমিদারকে বিবাহ ক'রে ফেল্লে। যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে দাঁড়িয়ে যুবক এই সংবাদ শুনলে, সেই দিনই শত্রু কর্ত্তৃক বিষাক্ত বাষ্পের দ্বারা সে জখম হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত সে রক্ষা পেল বটে, কিন্তু তার 'হার্ট্' চিরদিনের জন্য দুর্ব্বল হ'য়ে রৈল।···যুদ্ধ শেষ হ'ল ; যুবক আবার শহরে ফিরে এসে নৃত্যের-আসর জমালো।···এবার সে দর্শকদের এক অভিনব নৃত্য দেখিয়ে অভিভূত করবে।···এবার আর-এক নূতন নৃত্যসঙ্গিনী।

*

কিন্তু শেষ-মুহূর্ত্তে নৃত্যসঙ্গিনীটি আসরে নামতে পারলো না—অত্যধিক মন্তপানে তার দেহ অশক্ত হয়ে পড়েছে।…হেলেন আর তার স্বামী ছিল সেই নাচের আসরে।…যুবকের নাচটি মাটি হয় দেখে হেলেন তার স্বামীর অনুমতি নিয়ে যুবকের নৃত্যসঙ্গিনীরূপে আসরে নামলো…কী সে নৃত্য… অনির্ব্বচনীয়! ছেলেটির দেহ প্রেরণায় যেন উদ্বুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে, মেয়েটি হয়েছে আত্মহারা।

নাচের শেষে প্রচণ্ড করতালি পড়ল। কিন্তু সে করতালির উত্তরে যুবক দর্শকদের সামনে এসে তাদের অভিবাদন করতে পারলে না। তার দুর্ব্বল ফুস্‌ফুস্‌ উত্তেজনার প্রাবল্য সহ্য করতে না পেরে সহসা তার নিয়ম ভঙ্গ ক'রে চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল।

৬

Bolero—ছবিখানিতে নায়কের ভূমিকায় জর্জ্জ র‍্যাফ্‌টের অভিনয় এবং নৃত্যকৌশল অসামান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছে। নৃত্যকলায় জর্জ্জ র‍্যাফ্‌টের দক্ষতা আকস্মিক ব্যাপার নয়—বহুদিন ধরেই তিনি এই কারুশিল্পের চর্চ্চায় রত আছেন। Dancing তাঁর জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

•

এই ছবিতে শুধু জর্জ্জ র‍্যাফ্‌টের নৃত্য নয়, আর একটি মেয়ের অভিনব নৃত্যকৌশল একে শ্রীমণ্ডিত করেছে। মেয়েটির নাম - স্যালি র‍্যাণ্ড্‌। Fan Dance নামে একটি নাচের জন্য স্যালি দেশ-বিখ্যাত হয়েছিল। সেই নাচটিই প্যারামাউণ্ট কোম্পানী ক্যামেরায় বন্দী করেছেন। Fan Dance-এর অভিনব সৌন্দর্য্য নাকি রসিক-মহলে একদা বিষম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।

*

হলিউড্‌ গল্পিকাঃ

সম্প্রতি, গত বছরের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী ব'লে যিনি অভিনন্দিত হয়েছেন, সেই ক্যাথারিণ হেপ্‌বার্ণের মাত্র একখানি ছবির দেখবার সৌভাগ্য আমাদের আজ পর্য্যন্ত হয়েছে—Bill of Divorcement! ছবিখানিতে তিনি জন্‌ ব্যারিমূরের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। সে-ছবির মধ্যে ক্যাথরিণ যে খুব অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছিলেন, তা নয়, কিন্তু তবুও তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল যেন, আজ পর্য্যন্ত যে-সব অভিনেত্রীদের দেখেছি তাঁদের থেকে ক্যাথরিণের যে একটি নিজস্ব সত্ত্বা আছে, তার প্রতি লক্ষ্য না দিয়ে উপায় নেই। তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈচিত্র্যে, তাঁকে অন্য পাঁচজনের সঙ্গে এক করা যায় না—অন্য পাঁচজনের মাঝখান থেকে অতি সহজেই তাঁকে বেছে নেওয়া চলে। এই যে স্বাতন্ত্র, এই যে "different" রূপ, এইটিই হ'ল ক্যাথরিণ হেপ্‌বার্ণের প্রধান পরিচয়।

*

ক্যাথরিণ হেপ্‌বার্ণ-কে বলা হয়েছে Glamorous, Exotic and Severely independent…! অন্যগুলোর সম্বন্ধে মত যাই হোক, তাঁকে দেখে তিনি যে severely independent একথা বুঝতে দেরী লাগে না। During all of her Career She has interpreted roles as She wished to interpret them, not as even those who hired her wanted her to interpret them!… … … অন্য কোন অভিনেত্রী সম্বন্ধে এ-কথা কি আগে বলা হয়েছে?

বহুবার অভিনয়ের আগে তার একগুঁয়েমির জন্য ভূমিকা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ক্যাথরিণ তাতে বিচলিত হন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, এমন দিন আসবে যখন পরিচালক অন্য কোন অভিনেত্রীকে মনোমত করতে সক্ষম না হ'য়ে তাঁরই দ্বারে এসে উপস্থিত হবে। রঙ্গমঞ্চে Warrior's Husband নামক নাটকে সত্যিই এ-ব্যাপার ঘটেছিল!

তাঁর Morning Glory ছবিখানি শীঘ্রই কলকাতায় আসবে।

*

জান্‌বার মতো কয়েকটি তথ্য—

ইংলণ্ডে ছবির public প্রদর্শনী প্রথম হয় লণ্ডন সহরে পলিটেক্‌নিক্‌ রঙ্গগৃহে ১৮৯৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রোগ্রাম ছিল,—নির্ব্বাচিত দৃশ্য।

এ-কথা সত্য যে চলচ্চিত্রে অভিনেতৃরা যত মাহিনা পান, এত মাহিনা অন্য কোন কাজেই অন্য কেউ পায় না।

ঘাড়ে বিষম চোট্‌ লাগা সত্বেও (এমন আঘাত যে ঘাড় প্রায় ভেঙে গিয়েছিল বল্লেও অত্যুক্তি হয় না) যে-দুজন অভিনেতা তাঁদের কাজ বন্ধ না ক'রে অভিনয় করেছিলেন, সেই দু'জন অসাধারণ ব্যক্তির নাম, ডিক্‌ গ্রেস্‌ ও ফিলিপ্‌ স্মলি। গ্রেস জখম হয়েছিল Wings ছবিতে অভিনয় করবার সময়। স্মলির চোট লাগে ব্রুক্‌লিন-এ মোটর-সংঘাতে।

প্রথম জাপানী অভিনেতা, যে বিলাতী টকি ছবিতে অভিনয় করেছিল, তার নাম হচ্ছে Kyoshi Takase। ১৯৩০ সালে তোলা Red Pearls ছবিতে তার অংশ ছিল।

ছবিতে প্রথম দ্বৈত ভূমিকায় নেমেছেন Jack Muhall…একেবারে দুই ভীষণ পরস্পর-বিরোধী ভূমিকা—চোর ও পুলিস!! Pat and Mike নামক First National-এর ছবিতে তিনি এই কীর্ত্তি করেছিলেন।

অত্যদ্ভুত অভিনেতা লুপিনো লেন!···লোকটা একবার একটা ছোট্ট দু'রীলার ছবিতে (Only Me) একাই ছবির সমস্ত ভূমিকায় নেমেছিল—ছবিখানিতে ভূমিকার সংখ্যা বড় কম ছিল না, তেইশটা! একাই তেইশ্!!

*

স্বনামধন্য লেখক H. G. Well's এর Whither Mankind ছবির জন্যে বাট্ হাজার পাউণ্ড খরচ করা হবে। গ্রন্থকার তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের সিনপ্সিস্ তৈরী করেছেন এবং ছবি সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল হয়ে উঠেছেন। Whither Mankind ছবির সময় হচ্ছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরের পৃথিবী—বিচিত্র ও বিস্ময়কর। তখন গ'ড়ে উঠেছে আশ্চর্য্য নগর, অভিনব জনপদ; আকাশ-চুম্বী প্রাসাদ-শ্রেণী এবং অদ্ভুত দর্শন অদৃষ্টপূর্ব্ব কলকব্জার পাহাড়!

ছবিখানি যে চিত্রজগতে অভিনবত্ব আনবে, অভিজ্ঞেরা সে-বিষয়ে নিশ্চিত।

*

"চিত্রায়" "রূপলেখা" ছবিখানি দর্শকমহলে আশানুরূপ সাফল্য অর্জ্জন করেছে দেখে খুসী হয়েছে। ছবিখানি অনেকদিন ধ'রে রসিক-জনকে পরিতৃপ্তি দান করবে ব'লেই আমাদের ধারণা।

*

"রূপবাণীতে" "ঋণমুক্তি" কাল থেকে চতুর্থ সপ্তাহে প্রবেশ করবে।

*

"চাঁদসদাগর" ঢিমে-তেতালায় এখনো চলেছে। ছবিখানি remodelled হ'য়ে এখন আগের চেয়ে অনেকখানি মনোরম হ'য়ে উঠেছে।

*

কালী ফিল্মস্ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের যে উপন্যাসখানিকে সবাক চিত্রে রূপান্তরিত করবার আয়োজন করেছেন তার নাম "মণি-কাঞ্চন"। ছবিখানির নূতন নামকরণ হয়েছে—"তরুণী"। "তরুণীকে" জয়শ্রীমণ্ডিত করবার জন্য অনেকগুলি সু-অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমাবেশ করা হয়েছে; তাদের মধ্যে রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ভূমেন রায়, ডলি দত্ত, জ্যোৎস্না গুপ্তর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। "তরুণী"র সিনেরিও লিখেছেন, নিরঞ্জন পাল। শিক্ষকতার ভার নিয়েছেন তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী। পরিচালনা করবেন, গাঙ্গুলি মহাশয় নিজে, ছবিখানির সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে আছি।

*

শ্রীযুক্ত প্রমথেশ বড়ুয়া "রূপলেখার" সাফল্যে উৎসাহিত হ'য়ে তাঁর ভবিষ্যৎ ছবির জন্য গল্প নির্ব্বাচনে ব্যাপৃত আছেন। এবার তিনি বাঙ্লার অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কোন একখানি উপন্যাসের চিত্রনাট্য রচনা করবার সঙ্কল্প করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ-ও করেছেন।

শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব আখ্যান, জীবন্ত চরিত্রসৃষ্টি এবং সরস সংলাপ—ভালো পরিচালকের হাতের ভিতর দিয়ে এরা যদি যথাযথভাবে ছবির পরদায় রূপান্তরিত হয়, তাহ'লে আমার বিশ্বাস সে ছবি চিত্রজগতে landmark সৃষ্টি করবে।

প্রমথেশচন্দ্রের গল্প-নির্ব্বাচন সম্পর্কীয় সঙ্কল্পের প্রশংসা করি।

*

শুনলাম, পায়োনীয়র ফিল্ম কোম্পানী "মা" ছবি তোলবার রণে এখনো ক্ষান্ত দেন নি। নতুন কোন পরিচালক সংগ্রহ ক'রে অচিরেই তাঁরা কাজ আরম্ভ করবেন। ভাল কথা। যোগ্য লোকের হাতে যদি ভার অর্পণ করা হয়, তাহ'লে আনন্দিত এবং আশান্বিত হব। অন্য অনেক ক্ষেত্রেই অনেক সময় মেকি জিনিষ বেশ ভালো ভাবেই চ'লে যায়; কিন্তু চিত্রজগতে, বিশেষ ক'রে ছবির পরিচালনা প্রভৃতি টেক্নিক্যাল কাজে, মেকি চলে না কিছুতেই—একথা বারবার প্রমাণিত হয়ে গেছে। পায়োনীয়রের কর্ত্তৃপক্ষদের এই কথাটী মনে রাখতে অনুরোধ করি।

একখানি ছবির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের জন্যে চারআনা দায়ী অন্য সকলে। বারো আনা দায়ী তার পরিচালক। এবং পরিচালনা কাজটি নিতান্ত সহজ কাজ নয়। এ-কাজে সাফল্য অর্জ্জন করতে হ'লে সাধনা শিক্ষা এবং নিষ্ঠা থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। ছবির মালিকরা অভিনেতা অভিনেত্রী নির্ব্বাচনে যেমন মনোযোগ দেন, তার চেয়েও বেশী মনোযোগ দেওয়া উচিৎ পরিচালক নির্ব্বাচনে।

সঙ্কলন

সাহিত্য ও সুনীতি

[কামিনা রায়]

বর্ত্তমানে স্থানে স্থানে নীতি-শৈথিল্যের কথা শুনিয়া আমার যাহা মনে হইয়াছে আজ তাহাই তরুণ-তরুণীগণের নিকটে প্রকাশ করিতেছি। আমার মনে হয় নির্ব্বিচারে পাশ্চাত্য রীতিনীতির ও সাহিত্যের অনুকরণের আত্যন্তিক চেষ্টা এই শৈথিল্যের জন্য কিয়ৎপরিমাণে দায়ী। আমি বলিতে চাহি না যে যাহা-কিছু ভারতীয় তাহাই পাশ্চাত্য জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কোনও দেশের বা কোনও যুগের সভ্যতা অন্য দেশের এবং অন্য যুগের সভ্যতা হইতে সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং হিতকর, একথা স্বীকার করি না। এদেশে যে-সকল দুর্নীতি এবং কুরীতি আছে সে-সকল যেমন অবশ্য-বর্জ্জনীয় সেইরূপ পাশ্চাত্য দেশেরও যাহা অভদ্র, অশোভন এবং মানবচরিত্রের হীন দিকের প্রকাশ তাহাও বর্জ্জনীয়; যাহা ধর্ম্মভাব ও নীতিজ্ঞানকে সুদৃঢ় করে, রুচিকে নির্ম্মল করে, আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে উন্নত করে, সম্বন্ধের পবিত্রতা স্মরণপূর্ব্বক গৃহ পরিবার ও সমাজের হাওয়া বিশুদ্ধ রাখে, এক কথায় যাহা আমাদের মনুষ্যত্বের বিকাশ করে তাহাই সকল দেশের সভ্যতা হইতে গ্রহণীয়।

একটা কথা আছে "ঘ্রাণেন অর্দ্ধ ভোজনং"। দর্শন ও পঠন দ্বারা জীবনের অর্দ্ধ গঠন হয়, বলা বোধ হয় অত্যুক্তি নয়। সিনেমায় দেখা চোরডাকাতের অসমসাহসিকতা এবং অদ্ভুত কৌশল, চুরিডাকাতির দূষণীয়তা ভুলাইয়া অনেক তরুণ মনকে সেই সাহসিকতা ও কৌশলকলার মোহে অভিভূত করে এবং চুরিডাকাতিতে লিপ্ত করে। যাহা বারবার চক্ষে দেখা যায় তাহার সম্বন্ধে মানুষের ঘৃণা কমিয়া আসে বিশেষ হাস্যরস যদি তাহাতে প্রচুর পরিমাণে উৎসারিত হয়। তখন কতকগুলি অশ্লীল হাবভাব এবং দুষ্কার্য্য যেন একটা ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়।

রাস্তা ঘাটে গৃহে পরিবারে যাহা চক্ষে পড়ে তদপেক্ষা রঙ্গভূমিতে যাহা অভিনীত দেখা যায়, তার ছবি মনে দৃঢ় অঙ্কিত থাকে, মনের চিন্তা এবং প্রবৃত্তির উপর তাহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং অবস্থাবিশেষে কার্য্যেও তাহার প্রভাব প্রকাশ পায়। সাহিত্য সম্বন্ধেও সেই কথা। শক্তিশালী লেখকের দ্বারা চিত্রিত চরিত্র মনের মধ্যে স্থায়ী ছাপ রাখিয়া যায়। আমরা নিজের অজ্ঞাতসারে তাহাদের সঙ্গে লইয়া বেড়াই এবং সঙ্গগুণে যাহা ঘটিতে পারে, সাধু-অসাধু ভেদে তাহা ঘটিয়া থাকে। এদেশে নারীর সতীত্ব অর্থাৎ স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ প্রেম এবং শারীরিক সংযম ও শুচিতা চিরকাল নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচারিত এবং আদৃত হইয়া আসিয়াছে। সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী প্রভৃতি নারীর কথা পড়িয়া এবং মুখে মুখে শুনিয়া ভারতে নারীর উচ্চ আদর্শ সেই ভাবেই গঠিত হইয়াছে। কিন্তু যে-আদর্শ নারীকে দুশ্চরিত্র স্বামীর সেবাদাসী ও খেলার জিনিষ করিয়া রাখে, যাহা নারীকে আত্মমর্য্যাদা হইতে ভ্রষ্ট করে, এরূপ আদর্শও এদেশে আছে, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইউরোপের মহাদেশের উপন্যাসগুলির তর্জ্জমা এবং তাহাদের একান্ত অনুকরণে লিখিত গল্প উপন্যাস একদল তরুণ-তরুণীর প্রেম ও নীতির যে-আদর্শ নূতন করিয়া গড়িয়া দিতেছে তাহা আরও বহু গুণে শোচনীয়। আমার মনে হয়, অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদের হাতে এই সব বই দেওয়া বিধেয় নহে।

সাহিত্যের সমালোচক হইতে আমি ভয় পাই। অনেকের মত যে, সাহিত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার সম্বন্ধে—অর্থাৎ আর্ট সম্বন্ধে—নীতিবাদ খাটে না। অভিপ্রায়মূলক সাহিত্য, অর্থাৎ কোনও নীতির প্রচারের অভিপ্রায়ে, মানুষকে ভাল হইবার জন্য স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া যাহা লিখিত তাহা আর্ট নয়। যাহা সুন্দর এবং আনন্দ দেয় তাহাই আর্ট। এ কথা মানিয়াও কিন্তু বলিতে হয় যে, এক জিনিষই সকলের কাছে সমান সুন্দর এবং মধুর না-ও লাগিতে পারে। ফুলের নির্ম্মলতা, সৌন্দর্য্য এবং সৌরভ সকল মানুষকে সমান আনন্দ দেয় না। মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও আনন্দানুভূতির মূলে থাকে তাহার রুচি। এই রুচিকেই সর্ব্বাগ্রে সুগঠিত এবং বিশুদ্ধ রাখা আবশ্যক। কু-সাহিত্য, কু দৃশ্য মানুষের রুচিকে বিকৃত করে। যে-রকম সমাজ-নৈতিক ধারণা এবং তদনুরূপ আচরণ এ-দেশে ছিল না অথবা কেবল কদাচিৎ দেখা যাইত, তর্জ্জমা-করা উপন্যাসের অনুকরণে সেই ধারণা সেই আচরণ এবং নারীপুরুষের অবৈধ সম্বন্ধের কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেশের নূতন সাহিত্য-ব্যবসায়ীদের পুস্তককে কলঙ্কিত করিতেছে। সাহিত্য যখন ভবিষ্যৎ সমাজের জীবনকে গঠন করে তখন এরূপ সাহিত্যকে উৎসাহ না দেওয়াই উচিত। আর্ট নাম দিয়া অনেকে অনেক কিছু ক্ষমা করিতে প্রস্তুত। আমাদের দেশেই প্রাচীন অনেক ভাস্কর্য্যে অনেক কিছু আছে যাহা সাধারণ লোকের রুচিকে আঘাত করে। বর্ত্তমান শিল্পীরা তাহা অনুকরণ করেন না। আমাদের দেশের কাব্যে অনেক স্থানে অশ্লীল উপমার বর্ণনা আছে, এখন তাহা সুরুচিসঙ্গত মনে হয় না। সে-কালের আদিরসঘটিত রচনা এবং বর্ত্তমানের রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীতে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আমরা কোনটাকে এখন উচ্চাসন দিই? আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের সাহিত্যসাধনা দ্বারা দেশের চিন্তা ও চরিত্রকে উন্নত করুন এই প্রার্থনা।

একটা প্রশ্ন ওঠে "যাহা সত্য অর্থাৎ মানবজীবনে এবং সমাজে যাহা ঘটে, সাহিত্যে তাহা কেন স্থান পাইবে না?" অনেক তরুণ-তরুণীই আমাকে এই প্রশ্ন করিয়াছেন। তাহার উত্তরে আমি বলি "সাহিত্য আর্ট" এই জন্য। যাহা সুন্দর, যাহা আনন্দদায়ক, যাহা মনকে উর্দ্ধমুখ করে তাহাই আর্ট। চিত্রকর নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষলতা, পুষ্পাদি অঙ্কিত করেন, কিন্তু নর্দ্দমা ইত্যাদি অপবিত্র এবং কুদৃশ্য স্থান আঁকেন না। ঐ স্থানগুলিও সত্য এবং মানুষের পক্ষে আবশ্যক।

তরুণদিগের চালচলন এবং নৃত্য-অভিনয়াদি সম্বন্ধে আমি বলিতে চাই যে, নৃত্য মাত্রই দূষণীয় নয়। স্বাধীনভাবে চলাফেরা স্বাভাবিক এবং আবশ্যক, কিন্তু তাঁরা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে বিদেশীয় বেশ-বিন্যাসের এবং নৃত্যাদির নির্লজ্জতাটুকু পরিহার করেন। আপনার শরীরকে সকলে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখুন, উহা সকলের চক্ষের সম্মুখে অর্দ্ধাবৃত ও লোভনীয় করিয়া দেখাইবার যে উৎকট আকাঙ্ক্ষা পশ্চিমের বর্ত্তমান যুগের নারীদের পাইয়া বসিয়াছে,—তাহা তাহাদের দেশেও সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে না। দেহের সৌন্দর্য্যই নারীর চরম সৌন্দর্য্য নহে।

বিদেশ হইতে আনীত একটা কচুরি-পানা আজ বঙ্গ দেশের নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী ছাইয়া ফেলিয়া মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। কে জানে বিদেশী সাহিত্যের দুই-একটা আবর্জ্জনা ও বিদেশী নৃত্যের কুরুচির দ্বারা কত গৃহপরিবারে দুর্নীতি প্রবেশ করিবে।

সুরুচির পথে সুনীতি এবং সুনীতির সহিত যাহা সত্য, যাহা সুন্দর, এবং যাহা শুভ তাহাই আমাদের তরুণ সমাজকে গৌরবান্বিত করুক।

(প্রবাসী : ১৩৩৯)

কুজ্ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(সুমিত্রার পিতা ছিলেন কাঞ্চনপুরের একজন প্রবীণ রাজকর্ম্মচারী।... কয়দিন হইল কোন্ এক অদৃশ্য আততায়ীর হস্তে তিনি গুপ্তভাবে নিহত হইয়াছেন, কিন্তু অদ্যাবধি হত্যাকারীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। তাঁহারই বাল্যবন্ধু ও সহকারী ঊষানাথ কয়দিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না।)

প্রথম দৃশ্য

[কাঞ্চনপুরের অভিজাত-পল্লীতে সুমিত্রার বৃহৎ অট্টালিকার নিম্ন তলের বসিবার ঘর। কক্ষটী অতিশয় সুচারুরূপে সজ্জিত, তদ্দ্বারা গৃহস্বামীর সুপ্রচুর সমৃদ্ধি ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ঘরের পশ্চাৎ ভাগে দুইটী গবাক্ষ তাহারই পশ্চাতে নাতিক্ষুদ্র উদ্যান। জানালা দুইটীর খড়খড়ি উন্মুক্ত, ও তাহার ফাঁকে উদ্যানের কিয়দংশ দেখা যাইতেছে। বামপার্শ্বে কাল পুরু পর্দ্দা ঢাকা দ্বার, তদ্দ্বারা বাহিরে যাওয়া চলে। বিপরীত দিকে দক্ষিণের দেওয়ালে অপর একটী দ্বার ঐ বাটীর বিশ্রাম কক্ষের সহিত এই কক্ষটিকে সংযুক্ত করিয়াছে।

কাল সন্ধ্যা। আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। বাড়ীর চারিপাশে কি একটী দুঃসহ বিষাদের ম্লান ছায়া বিরাজ করিতেছে।

ঊষানাথ ও মালবিকা দুইখানি বিশ্রাম কেদারায় মুখোমুখী বসিয়া রহিয়াছেন। ঊষানাথের বয়স প্রায় ৫৫র কাছাকাছি। তাঁহার সুবিশাল সর্ব্বাঙ্গের উপর একটী ক্লান্তিহীন কর্ম্মপ্রেরণার সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। চক্ষু দুইটীর দৃষ্টি অতীব তীক্ষ্ণ ও প্রখর। মালবিকার বয়স অনুমান ২১। দীর্ঘ ছিপছিপে গড়ন। মুখে অবিমিশ্র সারল্য বিদ্যমান]

ঊষানাথ

কদিন থেকে কী পরিশ্রমই করছি! এই প্রহেলিকার ছিন্ন সূত্রগুলো সংগ্রহ করবার জন্য কত সম্ভব অসম্ভব চেষ্টাই করেছি, কিন্তু আজ ও আশার এতটুকু স্বল্প রশ্মি দেখতে পেলাম না।

[কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কি চিন্তা করিলেন] কিন্তু আমার মনে হয় এ রহস্য যতই জটিল হোক্ একদিন না একদিন এর সমস্ত অন্ধকারই দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে যাবে। জানো মালবিকা ঈশ্বরের রাজ্যে এ বিধান হতেই পারে না যে এত বড় একজন পাপীর শাস্তি হবে না। গোয়েন্দাগিরির শিক্ষানবীশি করে হাত প্রায় পাকিয়ে ফেলুম ;··· কিন্তু সত্যি বলতে কি এত বড় অদ্ভুত অসম্ভব ঘটনা আমি কখনো দেখিনি।···তাই বলে নিরাশ হলে তো চলবে না···যেমন করে হোক্ প্রতীকার করতেই হবে। সুমিত্রার বাবা যে আমার কী ছিল তা তো জানো না মা। এখনও তার কথা মনে হলে আমাদের অতীত জীবনের স্মৃতিগুলো ছবির মতই চোখের উপর ভেসে ওঠে। ওঃ আমাদের বাল্য কৈশোরের দিনগুলো কী আনন্দেই না কেটেছে। যৌবনে, এমন কি বার্দ্ধক্যের কিনারায় এসে পৌঁছেও আমাদের সে বন্ধুত্ব কখনো এতটুকু খর্ব্ব বা ক্ষুন্ন হয়নি···বরং সমকর্ম্মী বলে চিন্তায়, আদর্শে দুজনে প্রায় এক হয়ে গিয়েছিলাম। আজ প্রায় এক সপ্তাহ হলো সে আমাদের ছেড়ে

চিরদিনের মতই চলে গেছে, কিন্তু তার স্মৃতি ত আজও আমার মনে এতটুকু ম্লান হয়নি মা! [বৃদ্ধ রুমালে চক্ষু মুছিলেন]

মালবিকা

জ্যেঠা মশাই···

[উঠিয়া তাঁহার পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল এবং পরম যত্নে তাঁহার কেশ-বিরল মস্তকে হাত বুলাইতে লাগিল।

উষানাথ

[কিছুক্ষণ পরে উষানাথ প্রকৃতিস্থ হইয়া] সুমিত্রা কেমন আছে বল্‌তে পারিস্? আহা! বেচারী মা আমার!···ডাক্তার আজ কি বলেছেরে?

মালবিকা

ভাল না। সে যে কেমন করে এত বড় শোক ভুলবে তাই ভাবি। কদিন রাতেই সে এতটুকু বিশ্রাম করতে পারে নি।

কালও সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকেছে; এই মাত্র ঘুমুলো। ডাক্তার বলে ভয়ের আর কোন কারণ নেই। শ্মশান থেকে ফিরে এসে এই চিন্তাই তাকে পেয়ে বসেছে যেমন করেই হ'ক সে তার পিতৃ-হত্যাকারীকে খুঁজে বার কর্ব্বে···তার পিতার নির্ম্মম হত্যার প্রতিশোধ নেবে।

উষানাথ

আমাদের সকল আশাই তো তোমার উপর নির্ভর করছে মা।

মালবিকা

[হতাশ সুরে] আমি আর কী করব বলুন? যা জানি সবই তো আপনাকে বলেছি···কিছুই তো গোপন করিনি জ্যেঠামশাই।

উষানাথ

জানি। কিন্তু তুমি যা বলেছ সে সম্বন্ধে তুমি কি নিশ্চিত্।

[উদ্বিগ্নভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে মালবিকা দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিল না; সে চক্ষু আনত করিয়া মাটীতে নিবদ্ধ করিল।]

মালবিকা

আমি তো বলেছি জীবন মৃত্যুর এত বড় করাল রূপ আর দেখিনি! মৃত্যু যে এত ভয়ঙ্কর তা তো জানতুম না, তাই সেদিন আমারই পদতলের কাছে আমার আশ্রয় দাতার আর্ত্ত-কুঞ্চিত মুমূর্ষু দেহটাকে দেখে এত বিমূঢ় হয়েছিলাম! সে দৃশ্য স্মরণ হলে আজও আমার রোমাঞ্চ হয়···সে দিনের সেই বিহ্বল মুহূর্ত্তে কী যে বলেছি সব তো স্মরণ হয় না, জ্যাঠামশাই!

উষানাথ

জানি, তাই তোমাকে সেদিন আর কোন প্রশ্ন করে বিব্রত করিনি। সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার পর কদিন কেটে গেছে, তবু আজও হয় তো তোমাকে প্রশ্ন করা উচিত হ'লো না। কিন্তু মা, সুমিত্রার পিতা ও সুমিত্রার প্রতি প্রচুর সম্মান ও ভালোবাসা তোমার আছে এই বিশ্বাসেই তোমাকে বিরক্ত করতে সাহস করছি। জানো মা, এ দুর্ঘটনার সাক্ষীদের মধ্যে তুমিই প্রধান···হয় তো তুমিই একমাত্র সাক্ষী! তাই তোমাকে অনুরোধ করছি মালবিকা, যদি কিছু বলবার থাকে বল···হোক্ তা অতি তুচ্ছ, অতি ক্ষুদ্র। দেখি যদি তারই কোন সূত্র ধরে আমরা এই অনুসন্ধানের পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হতে পারি।

মালবিকা

বল্‌বার মত নূতন হয় তো আমার কিছুই নেই···তবু আপনারই আদেশে আমার পুরাণ বিবৃতিরই পুনরাবৃত্তি করে যাই, [কিছুক্ষণ থামিয়া] সেদিন ছিল শুক্রবার···সন্ধ্যায় সুমিত্রা কোন্ এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ গিছ্‌লো···রাত্রি তখন বোধ করি ৮টা, কাকাবাবু আর আমি সান্ধ্য ভোজনের পর বাগানে বেড়াতে বেরুলাম···সেদিন নূতন নয়, এমনি প্রায়ই যেতাম। শুক্লপক্ষ! টুকরো মেঘের ফাঁকে আকাশে তখন চাঁদ লুকোচুরি কচ্ছিল···দুজনে পাশাপাশি চল্‌ছিলাম···বাগানে নেমে বাঁধানো পথের উপর দিয়ে কিছু দূর গিয়েছি এমন সময় অদূরে ঝোপের মধ্যে পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি আর যেন কিসের শব্দ শুন্‌তে পেলাম্। মনে হল ও বুঝি কোন ভয়-চকিত পক্ষীদের পক্ষ আলোড়ন ধ্বনি, আর তাদেরই কণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বর। শব্দ শুনেই কাকাবাবু সচকিত হয়ে উঠলেন। ক'দিন ধরে···বিশেষ ডাকাতদের কাছ থেকে সাংঘাতিক পত্রগুলো পেয়ে তিনি যেন বিশেষ সতর্ক ছিলেন। মুহূর্ত্তে আমাকে স্পর্শ করে যেন ইঙ্গিতে নড়তে নিষেধ কর্লেন···বল্লেন, এইবার তাদের হাতে পেয়েছি, ছাড়ছিনে···এই বলে অন্ধকারে এগিয়ে গেলেন··· মুহূর্ত্ত আচ্ছন্নের মত দাঁড়িয়েছিলাম। তারপরই বন্দুকের শব্দ আর কার আর্ত্ত স্বর শুনে চমকে উঠলাম। কতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলাম জানি না, তারপর ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ঝোপের পাশে চাঁদের যেটুকু আলো পড়েছিলো তাতে দেখ্‌লাম আমারই পদতলের কাছে কাকাবাবুর রক্তাক্ত দেহ পড়ে রয়েছে। অদূরে প্রাচীরের উপর ছায়াময় এক মনুষ্য মূর্ত্তি... তার হাতের সেই সাংঘাতিক যন্ত্রটা থেকে তখনো ধোঁয়া বিলীন হয় নি।

উষানাথ

তারপর···

মালবিকা

চাঁদের আলোটুকু আবার মিলিয়ে গেল···সামনের অন্ধকারে আর কিছুই দেখা গেল না। ফিরে চেয়ে দেখলাম পাচিলের উপরের ছায়ামূর্ত্তি কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে।

উষানাথ

সুমিত্রার বাবা কি বল্লেন?

মালবিকা

কিছু না। কাছে গিয়ে দেখলাম তাঁর সর্ব্বাঙ্গ রক্তে আচ্ছন্ন, কণ্ঠে শুধু এক ক্ষীণ আর্ত্ত করুণ স্বর···

উষানাথ

আততায়ী কোন পথে পালালো বলতে পারো? বাগানের দরজা কি তখনো খোলাছিল?

মালবিকা

হয় তো না। কিন্তু প্রাচীর লঙ্ঘন করে তো অনায়াসেই যাতায়াত চলে।

উষানাথ

[চিন্তিত ভাবে] হুঁঃ। ডাকাতদের কাছ থেকে চিঠি পেয়ে সুমিত্রার বাবা কি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিল? একথা তো আমাকে কোনদিন বলেনি।

মালবিকা

তাঁর স্বভাবই ছিল ওই! কোন দিন মুখে কাউকে কিছু বলতেন না! কিন্তু আমি জানি, মনে মনে তিনি কদিন থেকে চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। দিন কয়েক আগের একটা ঘটনা বলি—সন্ধ্যার পর ড্রয়িং রুমে বসেছিলাম···হঠাৎ তিনি সচকিত হয়ে জানলার কাছে ছুটে গিয়ে কি যেন কান পেতে শুনে বল্লেন, "বাড়ীতে মানুষ আসার শব্দ পাচ্ছি মালবিকা" এই বলে তিনি বাইরে যেতে উদ্যত হলেন। সেদিন অতিকষ্টে তাঁকে থামিয়ে রেখেছিলুম। ভয় তাঁর হয়েছিল একথা বলিনে, কিন্তু কদিন ধরে তিনি ঐ সবই চিন্তা কেবল করতেন।

উষানাথ

বেচারী! সব দেখে শুনে মনে হয় এই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র রয়েছে। কিন্তু ব্যাপার যতই জটিল হোক এ রহস্যের মীমাংসা না করে এ বুড়ো কোনদিন ক্ষান্ত হবে না। যেমন করেই হোক পাপীকে শাস্তি দেব—এই আমার পণ।

[হঠাৎ উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিলেন, তাহার পর মালবিকা মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া।]

ও কি! জানলার পিছনে কিসের যেন শব্দ শুনলাম না? তুমি শুনতে পেয়েছ মালবিকা?

মালবিকা

[হাসিয়া] ও কিছু নয় জ্যেঠামশাই। প্রথম প্রথম আমাদেরও এই ভয় হয়েছিলো বুঝি কেউ এসে জানালায় ঘা দিলো। ওখানে একটা গাছের ডাল বাতাসে ছলে মাঝে মাঝে জানলায় আঘাত করছে···ও তারই শব্দ।

উষানাথ

[সন্দিগ্ধভাবে] তাই কি? বাতাস তো এখন তেমন জোর নয়।

মালবিকা

তা বটে, কিন্তু বাড়ীর ঐ কোনটায় সাধারণতই হাওয়া একটু বেশী···তাই।

উষানাথ

ওঃ [উঠিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া] আজ আমি চললুম...সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হল না। তার সঙ্গে আমার দু-একটি দরকারী কথাছিলো কিন্তু সে সম্পূর্ণ সুস্থ না হলে সাহস পাচ্ছি না। আহা, অভাগিনী কন্যা আমার, কী বলে যে তাকে সান্ত্বনা দেব জানিনে।

মালবিকা

এই কদিনেই সে যেন একেবারে বদলে গেছে। চিরদিন কোমল স্বভাবা সে, কিন্তু পিতৃশোকে শাবকহারা বাঘিনীর মতই সে ভয়ঙ্করী হয়ে উঠেছে। প্রতিশোধ আর পিতৃহন্তাকে শাস্তি দেওয়া ছাড়া এ কদিন তার মুখে অন্য কথা শুনিনি।

উষানাথ

এই তো চাই! তার পিতাও ছিল এমনি দৃঢ়চেতা, সে তার পিতার উপযুক্ত কন্যার মতই প্রতিজ্ঞা করেছে। তুমি সুমিত্রাকে আমার কথা বলো···না না প্রয়োজন নেই—আমিই আবার এসে তাকে সব বলবো। আচ্ছা মা মালবিকা, চল্লাম। না, না, আমাকে আর পথ দেখাতে হবে না, এ বাড়ীর প্রত্যেক ইট কাঠগুলোকে পর্য্যন্ত ভাল করেই চিনি।

[উষানাথ বামের দ্বার দিয়া বাহিরের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। মালবিকা কিছুক্ষণ তাঁহার গতি পথের দিকে চাহিয়া একটী জানালার নিকট গিয়া উহা খুলিয়া ফেলিল, অতি সতর্কভাবে ও নিঃশব্দে সেই পথে বিজয় প্রবেশ করিল]

বিজয়

(অতি চাপাস্বরে) মালবিকা! তুমি একা রয়েছ

মালবিকা

হাঁ।

বিজয়

সুমিত্রা কোথায়?

মালবিকা

ঘুমুচ্ছে।

বিজয়

[ব্যগ্রভাবে] সে কেমন আছে মালবিকা?

মালবিকা

ভাল না।

বিজয়

ভাল না কেন?

মালবিকা

ব্যস্ত হয়ো না—বিপদ কেটে গেছে। কিন্তু সে এত আঘাত পেয়েছে যে ভিষক বলেন এ থেকে তার মাথার রোগ হতেও পারে। এতদিন অবিশ্রান্ত উত্তেজনার পর এইমাত্র সে একটু ঘুমিয়েছে।

বিজয়

এই মাত্র তোমার সঙ্গে কে কথা বলছিলেন?

মালবিকা

শ্রেষ্ঠী উষানাথ, তিনিই এই হত্যাকাণ্ডের অনুসন্ধানের ভার নিয়েছেন। সাবধান বিজয়! তোমার ইঙ্গিত বদলাতে হবে। তোমার সঙ্কেতধ্বনি শেঠজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। তোমায় অনুরোধ, এমনি করে আর নিজেকে বিপন্ন করো না বিজয়। উষানাথের গোয়েন্দারা বাগানের চার পাশে ঘুরছে··· তোমাকে তারা লক্ষ্য করেছে কি না কে জানে?

বিজয়

না, আমি খুব সাবধানে এসেছি। কিন্তু সুমিত্রার সঙ্গে আজ আমার দেখা করা চাই-ই।

মালবিকা

উত্তম। সে জাগলেই তাকে ডাকবো।

বিজয়

আমি আর বিলম্ব করতে পাচ্ছিনে; তাকে সব কথা খুলে না বলা পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্ত আমাকে তিলে তিলে পলে পলে যন্ত্রণা দিচ্ছে। অনেক দিন বাধ্য হয়ে আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছে। তার পিতৃ শোকের দুর্নিবার ব্যথার মধ্যে আমার স্বীকারোক্তি হয় তো তাকে শুধু বেদনাই দিত, কিন্তু আর না—যেমন করে হোক্ তাকে সব কথা বলতেই হবে।

[উদ্ভ্রান্তভাবে পদচারণা করিতে লাগিল।]

মালবিকা

শান্ত হও বিজয়। সত্য তোমায় আমি গোপন করতে বলছি না। কিন্তু তোমার এই নিদারুণ ভীষণ কথা শোনবার মত শক্তি তাকে পেতে দাও।

বিজয়

তুমি জানোনা মালবিকা, যতই বিলম্ব করছি ততই আমি সুমিত্রার কাছে ক্ষমা পাবার অযোগ্যতর হয়ে উঠছি। কোন ছলেই আর আমার সত্য গোপন করা চলে না।

মালবিকা

নিজের দিকটাই তুমি বড় করে দেখনা বিজয়, সুমিত্রার কথাও ভাবতে হবে। আমিতো বলেছি অসাধারণ কিছু সহ্য কর্ব্বার মত মন তার আজও সবল হয়নি। প্রতিজ্ঞা করো আজ তাকে কোন কথা বলবে না, নচেৎ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, এই আমার আদেশ!

বিজয়

আদেশ! এত শক্তি তুমি কোথায় পেলে মালবিকা এ-যে আমি তোমায় চিন্তেই পাচ্ছিনে।

মালবিকা

এই শক্তিই আমাদের আছে। নারীদের দুর্ব্বলা পেয়ে মাঝে মাঝে তাদের উপর অবিচার করতে তোমরা ছাড়না, তাই আমাদের আত্ম প্রকাশ করতে হয়। সুমিত্রাকে আমি ভালবাসি, যেমন করে হোক তাকে বাঁচাতেই হবে।

বিজয়

উত্তম। তোমার আদেশই আমি গ্রহণ করলাম···তাকে আজ কোন কথাই বল্‌ব না।

মালবিকা

[তাহার হাত দুটী নিজের মধ্যে লইয়া]

তোমাকে ধন্যবাদ বিজয়···

বিজয়

বিনিময়ে তোমার কাছেও আমার কিছু প্রার্থনা আছে মালবিকা।

মালবিকা

কি! [প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল]

বিজয়

আমি চাই তুমিও তাকে কিছু ব'লো না। আমি নিজের মুখে সব দোষ স্বীকার না কর্‌লে শান্তি পাবনা।

মালবিকা

[হতাশ স্বরে] এইমাত্র! [মস্তক অবনত করিল]

বিজয়

মালবিকা!···

মালবিকা

কি?··· [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া]

বিজয়

[বিস্মিত স্বরে] একি, তুমি কাঁদছ?

মালবিকা

কিছুনা। ভাবছি তোমার অসম্ভব আতিশয্যের কথা। ভেবে দেখ বিজয়, তুমি এক উন্মাদ আগ্রহে তোমাদের এই সুনিবিড় ভালবাসা ভেঙ্গে দিতে চাচ্ছ। একি শুধু স্বার্থপরতা নয়? সাধুতার দোহাই দিয়ে তুমি সুমিত্রার জীবনের কত বড় সর্ব্বনাশ করতে বসেছো। কত বড় বিশ্বাসে সে তোমার কাছে আত্মদান করেছে। তোমাকে ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী বলে বরণ করেছে···কিন্তু যখন সে জানবে তোমারই অস্ত্র তার পিতৃহত্যা করেছে কত বড় বেদনায় তার হৃদয় চূর্ণ হয়ে যাবে ভেবে দেখেছ কি? ক্ষমা হয়তো সে তোমায় করবে···কিন্তু যে বিমুগ্ধ স্বপ্ন দিয়ে সে তার ভবিষ্যত জীবনের স্বর্গ রচনা করেছে তা বোধ করি মুহূর্ত্তে ধূলিস্যাত হয়ে যাবে। তাই বলি এ কাজ করোনা। মানুষের জীবনে কত রহস্য কত গোপন কথাই থাকে। তোমার দুষ্প্রকাশ্য সত্য না বল্‌লে জীবনে তোমাদের কতটুকু ক্ষতি হবে বিজয়?

বিজয়

স্পষ্ট করে বল মালবিকা···আমার যে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

মালবিকা

আজকের দিনের কথা হয়তো প্রথমে প্রহেলিকার মতই মনে হবে, কিন্তু আশা করি তুমি বুঝতে পারবে। অকল্পিত অচিন্ত্য ভাবে তুমি হঠাৎ সুমিত্রার পিতার মৃত্যুর কারণ হয়েছো···সত্যের দিক থেকে, ন্যায়ের দিক থেকে দেখতে গেলে এর জন্যতো তুমি দায়ী নও। মানুষের জীবনে হঠাৎ কত ঘটনা ঘটে, এও তেমনি একটী। তোমার হাতের অস্ত্র শুধু তোমারই অজ্ঞাতে অন্ধকারে সুমিত্রার পিতাকে হত্যা করেছে··· এই মাত্র। আমি যদি তোমার অবস্থায় পড়তাম এই নিষ্ঠুর সত্যকে অন্তর তলে চিরদিনের মতই সমাধিস্থ করতে ইতস্ততঃ কর্‌তাম না।

বিজয়

মালবিকা·· তুমি নারী তাই তোমার এমনি করে চিন্তা করা সম্ভব··· কিন্তু আমিতো তা শিখিনি। যাক আমি আর তর্ক করতে চাইনে। [কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব] আচ্ছা উষানাথ কিছু বল্লেন।

মালবিকা

বিশেষ কিছু না। তিনি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষীর খোঁজ করছেন, এইমাত্র। আচ্ছা, তুমি যখন পাঁচিলের উপর উঠেছিলে কেউ তোমায় দেখেছিলো?

বিজয়

হুঁ। কে যেন সেই সময় পাশের পথ দিয়ে যাচ্ছিলো···কিন্তু অন্ধকারে তাকে চিন্তে পারিনি। উষানাথ কি কোন প্রশ্ন কর্লেন?

মালবিকা

হাঁ···

বিজয়

তুমি তাঁকে কি বল্‌লে?

মালবিকা

নূতন কিছুই না। সেদিনও যা বলেছি, আজও তারই পুনরাবৃত্তি করলাম···তাঁর ধারণা এর সঙ্গে রাজনৈতিক কোন রহস্য সংশ্লিষ্ট আছে।

বিজয়

তিনি কি কাকেও সন্দেহ করেছেন?

মালবিকা

তোমাকে? একেবারেই না। এতদিন ধরে তুমি এ বাড়ীতে যাতায়াত করছ, কেউ তোমায় দেখেনি···বাড়ীর কোন ভৃত্য পর্য্যন্ত না। উষানাথ তোমার নামই হয়তো জানেন না।

বিজয়

সুমিত্রার বাবা তাঁকে কিছু বলেন নি?

মালবিকা

না। তোমার কথা মনে কর্ব্বার মত পর্য্যাপ্ত সময় তার ছিল না। তিনি ছিলেন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী···তোমার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের যোগ আছে এই জেনেই তোমার সুমিত্রার পানিপ্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন··· এই মাত্র। তিনি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ···তাঁর সংসারের কোন কথা নিয়ে কোন বন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করা তিনি পছন্দ করতেন না।

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৪শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২১শে বৈশাখ
১৩৪১

কলালাপ

আরাকান দেশকে ভারতবর্ষেরই একটি অঙ্গ বলা চলে। বিশেষ ক'রে আরাকান হচ্ছে বাংলা দেশেরই প্রতিবেশী। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের সঙ্গে যে ও-অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, তার অজস্র ঐতিহাসিক নজির আছে। বেশী দিনের কথা নয়, বাংলা দেশেরও কোন কোন অংশে আরাকান-রাজের প্রভুত্ব ছিল যথেষ্ট।

*

কিন্তু আধুনিক ভারতবর্ষের সঙ্গে আধুনিক আরাকানের পার্থক্য বড় অল্প নয়। আধুনিক ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন হয়ে তার অধিকাংশ নিজস্ব বিশেষত্বকে হারিয়ে ব'সে আছে, কিন্তু আরাকান সম্বন্ধে ও-কথা বলবার যো নেই। এবং এর আসল হেতু হচ্ছে, আরাকানীরা ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করেছে এই সেদিনে—অর্থাৎ গেল শতাব্দীর শেষ অংশে। আরাকানীরা এখনো তাদের নিজস্ব বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলবার যথেষ্ট সময় পায় নি।

*

ভারতবর্ষের অবিকৃত নিজস্ব নৃত্যকলা দেখতে গেলে এখন আমাদের অনেক খোঁজাখুঁজি ও যার-পর-নাই চেষ্টা করতে হয়। সে যেন অনেকটা পুনরাবিষ্কারের মত। পরন্তু, সে নাচও যে সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত, এ-কথাও জোর ক'রে বলবার উপায় নেই। ভারতের প্রাচীন মন্দির প্রভৃতির ভিতরে গেলে নাচের অনেক ছবি দেখি বটে ভাস্করের দৌলতে, কিন্তু তা দৃশ্যমান হ'লেও দৃশ্যসঙ্গীত নয়, কারণ তার মধ্যে ধ্বনিও নেই, জীবন্ত গতি-চাঞ্চল্যও নেই,—সেগুলি হচ্ছে নাচের স্থির ভঙ্গিমাত্র। কেবল ভঙ্গীকে নাচ বলা চলে না। এ-ছাড়া ভারতের নানা যায়গায় আরো যে-সব দেশী নাচ আছে, তা প্রাদেশিক নৃত্য, তার বয়স যে খুব বেশী এমন প্রমাণও নেই এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রাচীন নৃত্য-শাস্ত্রের বর্ণনার সঙ্গে তা মিলবেও না। ভারতে মুসলমান প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয় নৃত্যের জাত গেছে; বাকি যে-টুকু ছিল তারও বেশীর-ভাগ ফিরিঙ্গি প্রভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নর্ত্তকী
মিয়া-তান-চী ও মা-মিয়া-সিন

*

কিন্তু আরাকান মুসলমান-প্রভাবের দ্বারাও আক্রান্ত হয় নি এবং জনবুলের বুট দাগও তার গায়ে এখনো বেশী ক'রে চেপে বসে নি। সুতরাং সেকাল থেকে একাল পর্য্যন্ত আরকানী নৃত্যকলার ধারাবাহিকতা যে অক্ষুণ্ণ আছে এটুকু অনায়াসেই অনুমান করা যায়। বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি, অল্পদিনের অধীনতার ফলেই আরাকানে এর-মধ্যে কিছু কিছু দোআঁশলা নাচের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ও-কথা সত্য ব'লে মানলেও আরাকানের অধিকাংশ নাচই যে এখনো খাঁটি আছে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই একটুও। এবং এই কারণেই আনা পাব্‌লোভার মতন নর্ত্তকীও আরাকানী নাচ দেখে মনে করেছিলেন, তিনি এমন কোন অসম্ভব আর্ট দেখছেন, চেষ্টা করলেও যা দখলে আনা যায় না। তিনি ভারতীয় নাচ দেখিয়ে ভারতের কাছ থেকেই বাহবা আদায় করেছিলেন, কিন্তু আরাকানী নাচ দেখে মোহিত হয়েও তার নকল দেখাবার সাহস তাঁর হয়নি।

*

ভারত ভ্রমণ ক'রে পাব্‌লোভার অভিজ্ঞতা হয়েছিল, এইটুকু : Although art in India at one time stood very high, it is now completely neglected. It seems incredible that in this huge country there is absolutely no interest taken in creative art." হয়তো এ-কথায় অত্যুক্তি আছে, কিন্তু একে মিথ্যাও বলা যায় না। হয়তো ভারতে এসে পাব্‌লোভা এমন জনকয়েক লোকের সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পান নি, যাঁরা উচ্চশ্রেণীর ভারতীয় গান গাইছেন, ছবি আঁকছেন, নাচ নাচছেন বা সাহিত্য সৃষ্টি করছেন, কিন্তু বিপুল ভারতের মহাজনতার মাঝখানে তাঁরা কোথায় হারিয়ে যান সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুর মত! ভারতবাসীর জীবনের সঙ্গে ললিতকলার যোগসূত্র আবিষ্কার করা কত কঠিন! আমরা অধিকাংশই খাই দাই ঘুমোই বা বেড়িয়ে বেড়াই বা তাস-দাবার আসরে আড্ডা দি, এবং টাকা রোজগার বা দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মহাপ্রস্থান করি——আমাদের ভাবহীন মরু-জীবনের কঠোর শুষ্কতার মধ্যে ললিতকলার রসবিন্দু পড়তে-না-পড়তেই শুকিয়ে যায়! তাইতো পাব্‌লোভার জীবনীতে তাঁর স্বামী বলছেন : "I am not referring to the lower classes, generally quite uneducated, but even among the highest, among the numerous rajahs, who possess untold wealth, boundless territories, countless palaces, dozens of Rolls-Royces, there is no wish to do anything for their own national art and no interest is taken in it." গোঁড়া ভারতপ্রেমিকও এ মত্ সত্য নয় ব'লে উড়িয়ে দিতে পারবে না।

•

পাব্‌লোভা বোম্বাই ও কলকাতা দু-জায়গাতেই নাচ দেখবার অবসর পেয়েছিলেন। এবং ভারতীয় নর্ত্তকী সম্বন্ধে তাঁর মত্ হচ্ছে মাত্র এইটুকু : "There were undoubtedly some interesting moments from an artistie point of view ; she was certainly an artist, but that was all !"— কিন্তু ব্রহ্মদেশে গিয়ে তিনি দেখ্‌লেন, জাতীয় নাচের প্রতি আরাকানীদের অনুরাগ অত্যন্ত গভীর এবং "it could not be learnt, but was rather some inherited qnality, the result of racial customs" !

*

আমাদের মতন আরাকানীরাও জাতীয় নাচকে মরতে বা জীবন্মৃত হয়ে থাকতে দেয় নি। সেখানে নৃত্যকলার নিয়মিত চর্চ্চা হয় এবং প্রত্যেক আরাকানীই স্বদেশী নাচ দেখবার সুযোগ ছাড়ে না। বাংলাদেশে এখন যেমন এক নামগোত্রহীন নৃত্যকলা 'ওরিয়েন্টাল' বা প্রাচ্য নৃত্য ব'লে আদর পেয়েছে এবং যে কোন অনধিকারী মাত্র দু-এক বৎসর হাত-পা নাড়বার চেষ্টা বা অভ্যাস ক'রেই প্রকাশ্যে নর্ত্তক ব'লে আত্মপরিচয় দেবার ভরসা পায়, ব্রহ্মদেশে নাচের আসরে তেমন স্বেচ্ছাচারিতা দেখিয়ে কেউ নাচিয়ে নাম কেনবার সুবিধা পায় না। সেখানে যারা নাচিয়ে হ'তে চায়, নাচ শিখতে হয় তাদের শিশুকাল থেকেই। (রুশদেশেও নাচ শেখবার ব্যবস্থা এইরকমই।) ভবিষ্যতে যে নাচিয়ে হবে, তার দেহকে অধিকতর নমনীয় করবার জন্যে ওখানে নাকি অসম্ভব ভঙ্গিতে বেঁধে রাখা হয়!

*

ভারতীয় নাচের সঙ্গে আরাকানী নাচের মিল ও অমিল দুইই আছে। আরাকানী নাচের পায়ের ভঙ্গির সঙ্গে ভারতীয় নাচের পায়ের ভঙ্গি বেশী মিলবে না, কিন্তু হাতের ভঙ্গি মিলবে যথেষ্টই। উদয়শঙ্করের নাচে একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ছিল তাঁর তরঙ্গিত অঙ্গুলীর লীলা। এবং সংপ্রতি "ম্যাডান থিয়েটারে" যে আরাকানী নাচের মজ্‌লিস্ বসেছে সেখানেও নর্ত্তকীদের হাতের আঙুলে অবিকল সেইরকম তরঙ্গ-ভঙ্গি দেখে অবাক হয়েছি। এই আরাকানী নর্ত্তকীদের এমন আরো অনেক হাতের ভঙ্গি দেখলুম, যা ভারতীয় নয় ব'লে মনে হয় না। ভারতীয় নাচের সঙ্গে আরাকানী নাচের একটা বড় পার্থক্য হচ্ছে এই যে, আরাকানী নাচে নূপুর কথা কয় না, আনুষঙ্গিক সঙ্গীতই নূপুরের অভাব পূরণ করে।

•

যেখানে যত বেশী বাধা, শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্ফূর্ত্তি সেখানে নাকি তত বেশী। সকল বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে জটিলতার ভিতর থেকে তিনি করেন সরলতাকে আবিষ্কার। এই আরাকানী নাচিয়েদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বহু লক্ষণই বিদ্যমান আছে, তাই তাঁদের অসম্ভব দুঃসাহস দেখে আমরা বিস্মিত হইনি। যে-সব নৃত্যে অত্যধিক গতি বা ক্রিয়া বা অঙ্গসঞ্চালন আছে, পৃথিবীর সব দেশের নাচিয়েরাই সে-সব ক্ষেত্রে এমনধারা পোষাক পরেন যাতে-ক'রে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাধীনতায় কোনরকম বাধা না হয়। কিন্তু আরাকানী নাচিয়েরা তাতে রাজি নন। তাঁরা এমন সাজপোষাক প'রে আসরে আসেন, যা কেবল অন্যান্য দেশের সাধারণ নৃত্যশিল্পীকে নয়, যে কোন সাধারণ মানুষকেও সহজে চলা-ফেরা করতে দেবে না। কিন্তু সেই সাজপোষাকে তাঁরা অত্যন্ত অনায়াসে এমন সব দ্রুতগতিময় এবং সুকঠিন ও আশ্চর্য্য গতিপূর্ণ নৃত্যকৌশল দেখিয়ে যান, যা পৃথিবীর আর সব দেশের নৃত্যশিল্পীকেই স্তম্ভিত ও হতভম্ব ক'রে দেবে। আরাকানী নাচের এক একটি অঙ্গভঙ্গি দেখলে সন্দেহ হয়, হয়তো তাঁদের দেহের ভিতরে হাড়গোড় কিছুরই অস্তিত্ব নেই, কিংবা থাক্‌লেও সেগুলো এমন অস্বাভাবিক ভাবে গড়া, যা শারীর-সংস্থান-বিদ্যার কোন পাঠের সঙ্গেই মেলে না!

*

এই আরকানী নাচিয়েদের পোষাকেও প্রাচ্যের রং মাখানো আছে। এখানে বনে বনে কত রঙের ফুল ফোটে, গাছে গাছে কত রঙের পাখী গান গায়, আকাশের মেঘে মেঘে কত রং শোভাযাত্রায় বেরোয়— আরাকানী নাচিয়েদের পরিচ্ছদে যেন তারই বিচিত্র সমারোহ দেখা যায়। নাচের তালে তালে নানা ফুল ফুটছে রঙিন পুলকে, যত বিহঙ্গ গাইছে মৌন তানে, রবি শশী-তারা দুলছে ইন্দ্রধনুর ছন্দে! চোখের সাম্‌নে জেগে থাকে যেন কোন খেয়ালী রং-পাগলের অপূর্ব্বসুন্দর মত্ততা!

*

আর, আরাকানী নাচের আনুষঙ্গিক সঙ্গীত! একালের অধঃপতিত ভারতীয় নাচে সাধারণতঃ যে আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা থাকে, তা উল্লেখযোগ্য ব'লে মনেই করি না। একটা ভাঙা হার্মোনিয়াম, ফুটো ডাইনে-বাঁয়া ও বেসুরো বিলাতী বাঁশী থাক্‌লেই এখানকার থিয়েটারি নৃত্য সগর্ব্বে নিজেকে জাহির করে। একটা সারেঙ্গী ও ডাইনে-বাঁয়া থাক্‌লেই এখানকার প্রথম শ্রেণীর বাইজীরা নাচের ঢং আর পা দেখাতে একটুও নারাজ হয় না। এইতেই আমরা খুসি হয়ে বাহবা দিতে থাকি। যখন এর চেয়েও বেশী-কিছু পাবার সাধ হয় (সাধারণতঃ যা হয় না), তখন আমরা বিলাতী নাচের সভায় ছুটি ঐক্যতানবাদন শুনতে। তাই এদেশে যখন উদয়শঙ্করের প্রতিভা সর্ব্বপ্রথমে নাচের মজলিসে প্রাচ্যের উপযোগী আনুষঙ্গিক সঙ্গীতের ব্যবস্থা করলে, তখন এখানকার মাতব্বররা রীতিমত মাথা খাটাবার পর বুঝতে পারলেন যে, ও-ব্যবস্থাটা পাশ্চাত্য 'অর্কেষ্ট্রা'রই নকল ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু প্রাচ্যের অবিকৃত খাঁটি নৃত্যেও যে কি চমৎকার আনুষঙ্গিক

সঙ্গীতের প্রচলন আছে, এই ব্রহ্মদেশীয় নৃত্য দেখতে গেলে সকলেই সেটুকু উপলব্ধি করতে পারবেন।

*

গেল বারে এবং তার আগেও বলেছি যে, নৃত্যশিল্পীরা দেহ দিয়ে ছবি আঁকেন ও গান করেন (যে-জন্যে সংস্কৃত ভাষায় নাচের আর এক নাম 'দৃশ্যসঙ্গীত')। কিন্তু কেবল তাই নয়, তাঁদের সুষম তনু কবিতাও রচনা করতে পারে। আজ যাঁদের কথা বলছি, সেই আরাকানী শিল্পীরা দেহের রেখায় ছবিও এঁকেছেন, গানও গেয়েছেন এবং কবিতাও লিখেছেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মদেশীয় রীতি-নীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ আমাদের হয়তো মনে হ'তে পারে, এ-সব নাচের মধ্যে মনীষী, সংস্কৃতি ও সূক্ষ্ম কাব্য-সুষমার অভাব আছে অল্পবিস্তর। এবং বিশেষজ্ঞের ভাষায়, নাচ নাকি "expression of spiritual emotions", আরাকানী সভ্যতায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে যা লাভ করা সহজ হবে না। কিন্তু এ-সব অসুবিধার কথা আমরা অনায়াসেই ভুলে যেতে পারি, এই বৃহত্তর ভারতের সুরসিক কলাবিদরা যেটুকু আমাদের দান করেছেন সেইটুকু লাভ ক'রেই। এঁদের কাছে আমরা যা পেয়েছি, তা অপূর্ব, অসামান্য ও আশাতিরিক্ত। এ নাচ দেখবার এই দুর্লভ সুযোগ যাঁরা ছাড়বেন, তাঁদের পরে অনুতাপ করতে হবে নিশ্চয়ই, আপাততঃ আমরা এর বেশী আর কিছু বলতে পারি না। কারণ এত কথা বলবার পরেও আমরা বলতে চাই যে, আমরা যা দেখেছি তার কিছুই ভাষায় বর্ণনা করবার শক্তি আমাদের নেই। এমন অভাবিত নাচের ব্যবস্থা যিনি বাংলা দেশে ক'রেছেন, আমাদের পরম স্নেহাস্পদ সোদরপ্রতিম সেই শ্রীমান্ হরেন ঘোষকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করছি।

*

গত পূর্ব্ব-বারের "ডাকঘরে" এমন একখানি পত্র প্রকাশিত হয়েছে, যা "নাচঘরে"র কলঙ্ক ব'লে মনে করি। কার্য্যান্তরে ব্যস্ত থাকার জন্যে সেবারকার "নাচঘরে"র কিছুই আমরা দেখতে পারিনি। সেই ছিদ্রপথে এই পত্রখানি আমাদের অজ্ঞাতসারেই "নাচঘরে"র ভিতরে অনধিকার প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছে। কোন ভদ্রলোক "রূপেশের স্ত্রী" নামে একখানি নাটক লিখেছেন। এবং কোন ভদ্রলোক সমালোচনা করতে ব'সে তাকে সুখ্যাতি করতে পারেন নি। যদিও এই নাটক এবং সমালোচনা—এর কোনটিই দেখবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য আমাদের হয় নি, তবে এটুকু আমরা অনায়াসেই বলতে পারি যে, কারুর নাটক রচনায় বাধা দেবার শক্তি যখন আমাদের নেই, তখন কারুর বিরুদ্ধ সমালোচনায়ও বাধা দেওয়া আমাদের উচিত নয়। স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সকলেরই আছে—কারণ দুনিয়ায় এমন বই এখনো কেউ লেখেন নি যা সকলেরই ভালো লাগতে পারে। এজন্যে গোপনে "নাচঘরে"র পৃষ্ঠে আরোহণ ক'রে যিনি ব্যক্তিগত ও কুৎসিত আক্রমণ করতেও সঙ্কুচিত হন নি, তাঁর রুচি, ভদ্রতা ও রসবোধ—কোনটিরই প্রশংসা আমরা করতে পারলুম না। এত কথা বলছি এই কারণেই যে, যাঁকে লক্ষ্য ক'রে এই গরলোদগার, তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, সাহিত্য-সেবক এবং আমাদের বিশেষ সুহৃদ। চিরদিনই আমরা ব্যক্তিগত আক্রমণের বিরোধী। পত্রখানি যখন 'নাচঘরে'ই বেরিয়েছে, তখন পরের অপরাধের জন্যে আমরাই তাঁর কাছে মার্জ্জনা ভিক্ষা করছি।

গান

(হেমেন্দ্রকুমার রায়)

আমার মেঠো-ফুলের হীরের মালা!
তাই দিয়ে কে রোজ ভরে ঐ
বিহান-বেলার আলোর থালা।

*

বুনো বাতাস কার আদরে
গান শেখে ভাই এমন ক'রে,
'পিউ কাঁহা' ঐ ডাক্‌চে কারে
শুন্‌তে যে পাই, নই তো কালা!

*

লাঙল দিয়ে চষ্‌লে মাটি তেপান্তরের কাজ্‌লা ক্ষেতে,
শ্যাম্‌লা হাতের ছোঁয়ায় কে স্তায় সোনার ধানের আঁচ্‌লা পেতে।

*

ভোম্‌রা বাজায় যার বাঁশুরী,
কর্‌লে সে মোর মনকে চুরি,
কুঁড়েঘরেই রাজবাড়ী মোর,
তার হাসিতে হ'লে আলা!

'পাউই নৃত্য'

(শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যা দেখেছি আজও যে ঠিক তাই দেখবো এমন আশা করিনে। যে করে সে ঠকে রসের মজলিসে। আন্দাজ ১৮৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দে কলকাতার ময়দানে যে আন্তর্জাতিক শিল্পমেলা বসে সেই সময়ে ব্রহ্মদেশীয় নাচ প্রথম দেখি। প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে পুরোপুরি ব্রহ্মদেশীয় একটা নাট্যমঞ্চ মায় সাজ সরঞ্জাম বাজনা বাদ্যি নর্ত্তক নর্ত্তকী যেন মায়াবলে উড়িয়ে এনে বসানো হয়েছিল। সে এতদিনের কথা যে মনের মধ্যে সেই নৃত্যোৎসবের সম্পূর্ণ ছাপ ধরা থাকা সম্ভব নয়। শুধু মনে আছে যেন চোখের সামনে স্ফটিক আর সোনার সাজ পরা একদল কিন্নরী না মানুষ না পাখী না প্রজাপতি অপরূপ ভঙ্গীতে নেচে গেল। তারপর ভূপর্য্যটক নানা চিত্রকরের ফটো এবং পট থেকে এই নৃত্যকে বার বার দেখেছি প্রাচীন বহির্ভারতের মন্দিরাদির ভাস্কর্য্যে এবং নানাদিক দিয়ে প্রাচীন ব্রহ্মদেশীয় নৃত্যভঙ্গী ইত্যাদির একটা আভাস পেয়ে আসছি—এতে ক'রে একটা ধারণা আমার দৃঢ় হয়েছে যে কি অন্তর্ভারত কি বহির্ভারত দুই জায়গার নৃত্যকলার একটা যোগসূত্র বিদ্যমান আছে।

আমাদের নৃত্যশাস্ত্রের নিয়মাবলীর সঙ্গে কিংবা আধুনিক ভারতীয় নৃত্যের নানা হাব ভাব ঢং ঢাং-এর সঙ্গে এই নৃত্যের কতখানি মেলে না মেলে সেটার চর্চ্চা কলাবিদরা করবেন এ ক্ষেত্রও সেটা নয়। ময়ূর নৃত্যের একটু বর্ণনা বাল্মিকীর রামায়ণে আমি পেয়েছি শুধু সেইটিই আপনাদের জানিয়ে রাখি—অমী ময়ূরা শোভন্তে প্রনৃত্যন্ত স্ততস্ততঃ বৈঃ পক্ষৈঃ পবনোদ্ধূতৈর্গবাক্ষৈঃ স্ফটিকৈরিব।

এই সমীরণে পুচ্ছ মেলায় নৃত্যকারী ময়ূরগণে ক্ষণে ক্ষণে; মনে লয় গবাক্ষ স্ফটিকময় বিচলিত হয় ফুলগন্ধময় বসন্ত পবনে।

এই বর্ণনার প্রতিবিম্ব এই ব্রহ্মদেশীয় নর্ত্তকীদের নাচের একখানা ছবিতে সেদিন নাচঘর কাগজে ছাপা দেখলেম যখন তখন আমার ভারি কৌতূহল জাগল এই নৃত্য দেখবার জন্যে! আজ এই নৃত্যানুষ্ঠানের উদ্যোক্তা হরেনবাবু আমাকে আপনাদের সঙ্গে এক আসরে স্থান লাভের সুযোগ দিয়ে সত্যই আমাকে বাধিত করেছেন। বৃদ্ধ হ'লেও আমি রসপিপাসু, কাযেই বলবো রসের আয়োজন শুষ্ক বক্তৃতায়—নানম্——————।

হিন্দী সীতার আবহ-সঙ্গীত

(শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়)

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোম্পানীর নূতন ছবি "সীতা" দেখানো হচ্ছে নিউ সিনেমায়। বাঙলার—তথা ভারতের—শ্রেষ্ঠ পরিচালক দেবকী বসু যে-ছবির গঠনের জন্যে দায়ী, তা' যে বহু দিক দিয়ে দর্শককে খুশী করবার ক্ষমতা রাখে, এটা খুবই জানা কথা। কিন্তু হিন্দী "সীতা"-কে পর্দ্দার গায়ে প্রতিফলিত দেখবার ঠিক আগের মুহূর্ত্তটি পর্য্যন্ত যে-সন্দেহ আমাদের মনের আনাচে কানাচে প্রতিনিয়তই ঘোরাফেরা করছিল, সেটি হচ্ছে এই—দেবকীবাবু এ পর্য্যন্ত যে ক'খানি ছবি তুলেছেন, তার সব ক'টিতেই আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি করবার জন্যে তিনি পেয়েছিলেন রাইচাঁদ বড়ালকে এবং চণ্ডীদাস, পুরাণ ভকত, মীরাবাঈ এবং রাজরাণী মীরা (বাঙলা মীরাবাঈ-এর হিন্দী সংস্করণ)—প্রতিটি ছবিতেই রাইবাবু এই বিভাগটিতে যতখানি কৃতিত্ব প্রকাশ করেছেন, ততখানি দক্ষতা দেখানো ত' দূরের কথা, বাঙলাদেশে তোলা অন্যান্য ছবিতে এই বিশেষ বিভাগটিতে এমন সব হাস্যকর নমুনা দেখতে হয়েছে যে, রাইবাবু ছাড়া আর কেউ যে এ-ব্যাপারে কিছুমাত্র দন্তস্ফুট ক'রতে পারবেন, এমন ত' মনেই হয়না। কাজেই রাইচাঁদ বড়ালের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হয়ে দেবকীবাবু তাঁর হিন্দী সীতার সঙ্গীতাংশকে কি ক'রে তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী ছবির থেকেও ভালো না হোক্, অন্ততঃ সমপর্য্যায়ে রাখতে সক্ষম হন, সেটা ছিল আমাদের কাছে এক বিশেষ শ্রোতব্য ব্যাপার।

হাঁা, সত্যিই সীতার আবহ-সঙ্গীত-বিভাগটির (Back-ground Music) জন্যে আমাদের মনে যথেষ্টই আশঙ্কা ছিল, বর্ত্তমান বাঙলার শ্রেষ্ঠ গায়ক ও সুরশিল্পী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দে এই বিভাগটির পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেছেন, এ-সংবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্ব হ'তেই অবহিত হওয়া সত্ত্বেও। কৃষ্ণচন্দ্রের মধুকণ্ঠের আমরা মুগ্ধ ভক্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে অনবরত তাঁর গান শোনবার পরেও আমরা তাঁকে থামতে দিতে নারাজ হই; বলি—আরো শুনব।—মনে থাকেনা যে, কৃষ্ণচন্দ্রে হচ্ছেন একজন মানুষ এবং অনেক গান গাইবার ফলে যে পরিশ্রম হয়, তার জন্যে ক্লান্তি আসা গায়কের পক্ষে স্বাভাবিক। তখন আমাদের মন এই যুক্তিটাকেই সত্য ব'লে গ্রহণ ক'রতে চায় যে, বহুক্ষণ ধ'রে একই গায়কের কণ্ঠনিঃসৃত গান শুনেও আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় যদি ক্লান্তি অনুভব ক'রে না থাকে, তা' হ'লে সেই গায়কই বা ক্লান্তিবোধ করবেন কেন? কারণ, বহু সঙ্গীতের আসরে উপস্থিত থেকে ঠিক এর উল্টোটাই ঘটতে দেখেছি;—সেখানে শ্রোতার অবস্থা হচ্ছে—"হামতো ছোড়্‌নে মাঙ্গতা, লেকেন কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা"—গোছের; গায়কের ভাব-ভঙ্গি-অবয়বে ক্লান্তির কোনও লক্ষণই নেই, কিন্তু শ্রোতা ছাড়চেন পালাই-পালাই ডাক। এইখানে এই কথাটা খুলেই ব'লে রাখ্‌তে চাই যে, বর্ত্তমানে বাঙালীদের ভিতর কৃষ্ণচন্দ্র দে'র থেকেও সঙ্গীত-ব্যাপারে বড় ওস্তাদ আছেন কি না, সে-তর্ক আমরা এখানে আদৌ করছিনা। আমরা মাত্র ব'লতে চাই এবং বেশ বড় গলাতেই ব'লতে চাই, গান শুনিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আমাদের যতখানি খুসি ক'রতে পারেন, ততখানি বা তার কাছাকাছিও খুসি করবার ক্ষমতা বর্ত্তমানে আর কোন বাঙালী-গায়কের নেই। একথা বলবার একাধিক কারণ আমরা নির্দ্দেশ ক'রতে পারি, কিন্তু আপাততঃ তার প্রয়োজন দেখ্‌ছিনা।

গানে সুর-যোজনাতেও কৃষ্ণচন্দ্রের জুড়ী মেলা ভার, এও একটি পরম সত্য কথা। গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুর সংযোগ করবার অদ্ভুত গুণপণা দেখিয়ে তিনি বহু রসিক সমঝদারের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আদায় ক'রতে পেরেছেন। ভাবের দিক দিয়ে দরিদ্র এবং ভাষার দিক দিয়ে দুর্ব্বল—এমন অনেক কুলিখিত গান আজ মাত্র কৃষ্ণচন্দ্রের অপরূপ ও বিচিত্র সুরযোজনা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রাণভরা কণ্ঠ দিয়ে গীত হওয়ার গুণে সাধারণের মাঝে জনপ্রিয়তা অর্জ্জন ক'রে বাঙলার ছেলে-মেয়ের মুখে মুখে ঘুরছে। আশা করি, এক, দুই, তিন ক'রে তাঁদের সংখ্যাগণনা করবার বিশেষ আবশ্যকতা নেই।

আমাদের মতের সঙ্গে সায় দিন, আর নাই দিন, কৃষ্ণচন্দ্র দে হচ্ছেন বর্ত্তমান বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক এবং সুর-শিল্পী (এখানে সুর শিল্পী কথাটি ব্যবহার করছি সেই শ্রেণীর লোক সম্পর্কে, যাঁরা বিভিন্ন গানে সুরযোজনা ক'রে থাকেন)। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র সম্বন্ধে এই উচ্চ মত পোষণ করা সত্বেও হিন্দী সীতার আবহ-সঙ্গীত (Back-ground Music) সম্পর্কে আমরা নিশ্চিন্ত হ'তে পারিনি।

গান গাওয়া এক জিনিষ, আর একখানি গানে সুরযোজনা করা আর এক জিনিষ—এই দুই কাজ একই শক্তির ওপর নির্ভর করেনা। তেমনই কোনও সবাক্ চিত্রে আবহসৃষ্টির এবং আনুষঙ্গিক সঙ্গীত সংযোগ করার জন্যে প্রয়োজন হয় এক বিশেষ শিল্পবুদ্ধির। যে-লোক গানের ভাব ও ভাষা অনুযায়ী সুরযোজনায় পটু, সে কথক-ছবির গল্পের মূল মর্ম্ম বুঝে তার বিভিন্ন দৃশ্যে ঘটনা ও ভাবকে অনুসরণ ক'রে উপযুক্ত আবহ সৃষ্টির জন্যে যথাযথ আনুষঙ্গিক সঙ্গীত যোজনা ক'রতেও যে সমানভাবে দক্ষ হবে, এমন কথা জোর ক'রে বলা যায় কি? তা' ছাড়া কোনও গানে সুর-যোজনার ভালোমন্দ মাত্র সুরযোজকেরই ওপর নির্ভর করে, কিন্তু আবহ-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয় সমবেত চেষ্টায় সম্মিলিত শক্তিতে কোনও দৃশ্যের ঘটনাকে ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ক'রে তোলবার জন্যে ঠিক কোন্ সুর-তরঙ্গের সৃষ্টি ক'রতে হবে, মাত্র এইটুকুই ভেবে ঠিক ক'রলে চলবেনা, সেই তরঙ্গ-সৃষ্টির জন্যে কোন্ কোন্ যন্ত্রের কতখানি সাহায্যগ্রহণ ক'রতে হবে, সেটিও সঙ্গে সঙ্গে নির্দ্ধারণ করা চাই এবং সেই সেই যন্ত্রবাদকদের ঠিকমত উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা গঠিত ক'রে নেওয়াও প্রয়োজন। বাঁধা-ধরা গৎ সবাই মিলে বাজিয়ে গেলেই যে আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না, এ-সত্যটুকু এতদিনে নিশ্চয়ই বাঙলাদেশের পরিচালকদের মস্তকে প্রবেশ করেছে। সবাক্ চিত্রে আবহ-সঙ্গীত সৃষ্টি গীতি-বিদ্যার এক নূতন বিভাগ; আমাদের দেশের সঙ্গীত-নায়কেরা এতকাল গানের ব্যাপারে যা-কিছু আলোচনা ক'রে এসেছেন, তা থেকে এর স্বাতন্ত্র্য আছে এবং এই বিভাগে সত্যিসত্যিই কৃতিত্ব দেখাতে হ'লে রসশিল্পীকে নূতন ভাবনার পথে নিজের মস্তিষ্ককে চালিয়ে দিতে হবে, আবহ-সঙ্গীত সম্বন্ধে নব নব উপায় ও ধারা উদ্ভাবন ক'রতে হবে।—এই ধরণের ভাবনা প্রতিনিয়তই আমাদের মাথাকে আঁকড়ে ধ'রে রয়েছে ব'লেই এই কথা ব'লতে ইতস্ততঃ করছিনা যে, শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র হিন্দী "সীতা"র সঙ্গীত-পরিচালক, এ-সংবাদ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া সত্বেও আমরা ছবিখানির আবহ-সঙ্গীত বিষয়ে পূর্ব্ব হ'তেই কোন উজ্জ্বল ধারণা মনের মধ্যে গঠিত করতে পারিনি, বরং এ-বিষয়ে আমাদের চিত্তে রীতিমত আশঙ্কাও ছিল। কিন্তু আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করছি, আমাদের এ-আশঙ্কা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে অবিসংবাদীভাবে। শুধু তাই নয়, হিন্দী "সীতা"র আবহ-সঙ্গীত হয়েছে গোড়া থেকে শেষ অবধি এমনই উচ্চ স্তরের যে, কৃষ্ণচন্দ্রের গুণপনা দেখে আমরা দস্তুরমত বিস্মিত হয়ে গেছি। হিন্দী সীতায় বহু আকর্ষণের ভিতর এর আবহ সঙ্গীত হচ্ছে একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ। প্রায় প্রতিটি দৃশ্যেই নেপথ্য থেকে বিচিত্র সুরতরঙ্গ ভেসে এসে দৃশ্যান্তর্ব্বর্ত্তী ঘটনার ভাবকে বহুগুণে সুপরিস্ফুট ক'রে তুলতে সাহায্য করছিল এমনই সুন্দরভাবে যে, আমাদের মন বারংবার আনন্দে মাথা নেড়ে ব'লে উঠছিল—এইত' চাই, একেই ত' বলে Back-Ground Music; এ মাত্র ঘটনাকে যথাযথ অনুসরণ ক'রেই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করছে না, প্রতিনিয়তই ঘটনার ভাবধারাকে ঘনীভূত, বিকশিত, মহিমান্বিত ক'রে আমাদের চোখ-কাণের ভিতর দিয়ে মনের দুয়ারে পৌঁছে দিচ্ছে। সুরতরঙ্গ কোনও দৃশ্যকে কতখানি সুন্দর ও মনোহর ক'রে তুলতে পারে, তার একাধিক উদাহরণ আছে এই হিন্দী "সীতা"য়। ধাবমান অশ্বশ্রেণী বেগে পথ অতিক্রম ক'রে চলেছে—অশ্বের অগ্রগতি ঘটনাকে নিশ্চয়ই দ্রুত তালে এগিয়ে নিয়ে যায়-নি; তবু অশ্বের গতির তালে তালে তাদের গলসংলগ্ন ঘণ্টার মধুর নিক্কণ দৃশ্যটির সৌন্দর্য্যকে কি অদ্ভুতভাবে বর্দ্ধিত করেছে, তা অবর্ণনীয়। বাল্মীকিকে নিয়ে রথ ছুটে চলেছে—বাল্মীকির মনে তখন আনন্দের অবধি নেই; তিনি সংবাদ বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন সীতার কাছে—অশ্বমেধ যজ্ঞের জন্য শ্রীরামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করেছেন স্বহস্তে।—বাল্মীকির মনের এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ কি অপূর্ব্বভাবে প্রকাশিত হয়েছে নেপথ্য সঙ্গীত-বিধানে, তা বুঝিয়ে বলবার উপায় নেই—এখানে সঙ্গীতসৃষ্টির অভিনবত্বও বড় অল্প নয়; যন্ত্র-সঙ্গীতের সহযোগে ব্যবহৃত হয়েছে মনুষ্য-

কণ্ঠ—সে কণ্ঠ থেকে শুধু সুরই ভেসে আসছে, কথা নয়। যেখানে কৌতুক-দৃশ্য দ্বারা হাল্কা রসের অবতারণা করা হয়েছে, সেখানেও যন্ত্র-সঙ্গীতের এই অভিনবত্ব দেখা যায়—মানুষের মুখের কৌতুক-হাস্যকে আনুষঙ্গিক সঙ্গীতযোগে বহুগুণে উচ্চতর ক'রে তুলে আরও কত effective ক'রতে পারা যায়, তার চূড়ান্ত নমুনা এই সীতায় আছে।—এই ধরণের বহু বৈচিত্র্যময় অভিনবত্বে হিন্দী সীতার আবহ-সঙ্গীত আগাগোড়া সুসমৃদ্ধ। গভীর এবং হাল্কা, করুণ এবং বীভৎস—সর্ব্বশ্রেণীর রস সম্পাদনে এতখানি সার্থকতা লাভ করা বাঙলাদেশে—এমন কি সমগ্র ভারতবর্ষে—তোলা আর কোনও ছবির ভাগ্যেই আজ পর্য্যন্ত ঘ'টে ওঠেনি। আমরা আরো আশ্চর্য্য হচ্ছি এই ভেবে যে, নিষ্ঠুর নিয়তির বিধানে চক্ষু-রত্নে বঞ্চিত হয়েও প্রত্যেক দৃশ্যের রস এমন গভীর ভাবে কেমন ক'রে তিনি গ্রহণ করতে পেরেছেন! অবশ্য এথেকে এইটিই ভালো ক'রে প্রমাণিত হচ্ছে যে, খাঁটি শিল্পীরা ভিতরের চোখ দিয়ে যতখানি দেখতে পান, আমাদের বাইরের চোখ ততখানি পৌছতে পারে না কোনদিন। আমরা হিন্দী সীতার সঙ্গীত-পরিচালক কলাবৎ কৃষ্ণচন্দ্রকে অভিবাদন করছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও আমরা বিনা দ্বিধায় উচ্চারণ করছি যে, এই একখানি ছবিতেই কৃষ্ণচন্দ্র প্রমাণিত করেছেন যে, কথকছবির সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে তাঁর স্থান ভারতের আর কোন পরিচালক থেকে নীচে ত' নয়ই, বরং সকলের পুরোভাগে এবং অনেকখানি উচ্চে; এত উচ্চে যে, তাঁর নাগাল পেতে যে-কোনও সঙ্গীত-পরিচালককেই হার মানতে হবে। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্প-পরিচালক দেবকী বসু যোগ্যসহকারী লাভ করেছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-শিল্পী কৃষ্ণচন্দ্রের ভিতর—এই "সীতা" ছবির নির্ম্মাণকার্য্যে।

চিত্রপুরী ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(রঞ্জন রুদ্র)

চিত্র পরিচয় ঃ (১) **Catherine the Great**

(লণ্ডন ফিল্ম প্রোডাক্‌সান)

পরিচালক—Alexandar Korda

প্রধান ভূমিকায়—এলিজাবেথ বার্গ্‌নার; ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক্‌স্ (ছোট); প্রভৃতি।

এম্পায়ার থিয়েটারে দেখানো হচ্ছে।

•

Catherine-এর পরিচালক করডা ইতিপূর্ব্বে অনেকগুলি ছবি পরিচালনা করেছেন; কিন্তু গত বছর Private Life of Henry VIII ছবিখানি পরিচালনা ক'রে তিনি যত প্রশংসা পেয়েছেন ততখানি প্রশংসা খুব কম লোকেই পেয়েছে। আলোচ্য-ছবিখানিতে তিনি নাকি তাঁর পূর্ব্ব কৃতিত্বকেও অতিক্রম করেছেন।

উক্ত ছবিখানিতে নায়িকার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছেন তিনি চিত্রজগতে নতুন; কিন্তু এই ছবিতে তাঁর অসামান্য সাফল্যের জন্যে তাঁকে তারকার আসনে উন্নীত করা হয়েছে।—এলিজাবেথ বার্গ্‌নার সত্যিই ভালো অভিনয় করেছেন।

একটি ভীরু লাজনম্র রাজকুমারী কেমন ক'রে স্বামীর অবহেলা অবজ্ঞার মধ্যে দিয়ে জাতীর জনপ্রিয়া সাম্রাজ্ঞীতে পরিণত হ'ল—এই ছবিতে নানা ঘটনার মধ্যে সেই কাহিনীকেই চিত্রিত করা হয়েছে।

পাগল এবং উচ্ছৃঙ্খল Grand Duke-এর ভূমিকায় ছোট ডগলাস যে অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন, তাও নিতান্ত সাধারণ নয়।

•

(২) **His Double Life** (প্যারামাউণ্ট্)

পরিচালক—আর্থার হপকিন্স্

প্রধান ভূমিকায়—লিলিয়ান গিশ্ ও রোলাণ্ড ইয়াং

কাল থেকে এলফিনষ্টোনে আরম্ভ হবে।

•

বহুদিন বাদে আবার লিলিয়ান গিশ্-কে ছবির পরদায় দেখা যাবে। এককালে এই করুণ-নয়না অভিনেত্রীটির প্রতিষ্ঠা দর্শকদের কাছে বড় কম ছিল না। ট্র্যাজিক ভূমিকার অভিনয়ে তাঁর জোড়া ছিল না বল্লেও অতিশয়োক্তি হয় না। তাঁর "ওয়েডাউন ইষ্ট"; "বার্থ অফ এ নেশান"; "ইন্‌টলারেন্স" প্রভৃতি ছবিগুলি যে দেখেছে সে কোনদিন ভুলবে না। টকির পর তাঁর একখানি ছবি দেখেছি—One Romantic Night! খুব ভালো লাগেনি; তবে সে তখন টকির প্রথমাবস্থা। বহুদিন পরে তাঁকে এবার যে ভূমিকায় দেখবো, সেটি আর আগের মতো করুণ ভূমিকা নয়—এর শেষে আছে মিলনের মাধুর্য্য। লিলিয়ান নিজে পছন্দ ক'রে এই ভূমিকাটি নিয়েছেন।

•

His double life-এর গল্পটি ভারি মজার।

প্রিয়ম ফ্যারেল ছিল একজন শিল্পী। তাঁর ছবির আদর ছিল যথেষ্ট। কিন্তু জনসাধারণ লোকটিকে কখনো চোখে দেখে নি—মানুষের সঙ্গে ফ্যারেল সইতে পারতেন না, সব সময় একান্ত নির্জ্জনে বাস করতেন।

একদিন প্রবাসে যাবার পথে তাঁর ভৃত্য লীক্ নিমোনিয়ায় মারা পড়ল। ডাক্তার এসে কিন্তু লীক্-কে ফ্যারেল এবং ফ্যারেল-কে লীক ব'লে ভুল করলে। ফ্যারেল চেষ্টা ক'রেও এই ভুল ভাঙ্তে পারলে না; ফলে তাঁকে লীক সেজে ভৃত্যের জীবন অতিবাহিত করতে হ'তে লাগলো—জগৎ জানলে বিখ্যাত শিল্পী ফ্যারেল মারা গেছেন।

য়্যালিস্ নামে একটি মেয়ের সঙ্গে লীক্-এর পত্রযোগে আলাপ চলছিল। সে আলাপ এখন মৌখিক প্রেমে পরিণত হ'ল। শেষে ফ্যারেল এবং য়্যালিস বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'ল।

আয় না থাকায় বাধ্য হ'য়ে ফ্যারেল স্ত্রীর ভরণ পোষণের জন্যে ছবি আঁকতে লাগ্লেন এবং তাইতেই অবশেষে ধরা পড়লেন যে তিনিই হচ্ছেন আসল ফ্যারেল, লীক নন। ঘোরতর মাম্লার সময় য়্যালিসের কথাতেই ফ্যারেল নিজের পরিচয় দিলেন। এই সময় আবার লীক্-এর এক পুরাতন স্ত্রী এসে রঙ্গস্থলে হাজির হ'ল।

বিচারের পর ফ্যারেল য়্যালিস-কে নিয়ে জাহাজে চ'ড়ে 'মধুচন্দ্রিকা' যাপন করতে চল্লেন।

*

হলিউড গল্পিকা ঃ

জানবার মতো কয়েকটি তথ্য—

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় সিনেমা-গৃহ হচ্ছে নিউ ইয়র্কের "রক্সি"—। ছ'হাজার পাঁচশো লোক তাতে বসতে পারে।

প্যারিসের সব চেয়ে বড় চিত্রগৃহের নাম, গমন্ট্ প্যালেস। ছ'হাজার লোক ধরে।

ইংলণ্ডের সব চেয়ে বড় চিত্র-ভবনের নাম হচ্ছে The Trocadaro, Elephant and Castle! সাড়ে পাঁচ হাজার লোক ধরে।

আমেরিকায় সবশুদ্ধ সিনেমাগৃহ আছে বিশ হাজার পাঁচ শো! সারা য়ুরোপে আছে তার চেয়ে সাত হাজার বেশী!

নিউ ইয়র্কে চিত্রগৃহের অধ্যক্ষের কাজ শেখাবার জন্যে একটি স্কুল আছে। সেখানে ছ'মাস-এর পাঠ দেওয়া হয়।

যুক্তরাজ্যের মধ্যে প্যারামাউন্ট্ কোম্পানী ছ'শো চিত্রগৃহের মালিক।

Arrowsmith ছবিখানির মধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ দৃশ্য ছিল ছশো চব্বিশ। প্রায় প্রত্যেক দৃশ্যটি তিনবার ক'রে তোলা হয়েছিল!

একখানি ভালো ছবি সারা জগতে প্রায় পঞ্চাশ হাজার সিনেমায় দেখানো হয়। এর থেকে স্পষ্টই ধারণা করা যেতে পারবে, একজন ছায়াচিত্রের "তারকা" কতখানি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করবার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন।

চিত্র-সম্পাদকগণ ছবির কাট-ছাঁটের জন্যে পুরণো ক্ষুর ব্যবহার করেন।

নীরব যুগে জনপ্রিয় ছবির Titleগুলি ছত্রিশটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হ'ত।

সাধারণতঃ, একখানি ছবি তোলবার জন্যে তিন সপ্তাহ সময় অতিবাহিত করা হয়।

একটি ষ্টুডিয়োয় সারাদিন কাজ হলেও যে ছাঁচটুকু উৎপন্ন হ'ল ছবির পরদায় তার মেয়াদ হয়ত পাঁচ মিনিটের বেশী নয়।

Hells Angels ছবিখানিকে বলা হয় one of the most expensive

films ! ছবিখানি তুলতে আট লক্ষ পাউণ্ড্ (!!) খরচা হয়েছিল। খরচাকে এই ভাবে ভাগ করা হয়েছিল : নেগেটিভ্ ও ডেভেলপিং, ৬২ হাজার পাউণ্ড ; বিমান বিহারের দৃশ্য, চার লক্ষ বাইশ হাজার ছ'শো ; দৃশ্য ও পোষাক, এক লক্ষ চার হাজার ; অভিনেতৃদের মাহিনা, ৬৬ হাজার ; অন্যান্য শিল্পীর মাহিনা, ৪৫ হাজার ; জেপলীন-দৃশ্য, ১ লক্ষ ২ হাজার ৪ শো ; প্রথমে ছবিখানিতে শব্দ সংযোজনা করা হয়-নি। পরে চাহিদা অনুসারে তার মধ্যে শব্দ যোজনা করা হয়।

*

রাধা ফিল্ম কোম্পানীর—"দক্ষ-যজ্ঞের" কাজ দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছে। এক সঙ্গে হিন্দি ও বাংলা সংস্করণ তোলা হচ্ছে। বাঙ্লায় সতীর ভূমিকা নিয়েছেন চন্দ্রাবতী ; হিন্দীতে, রাধাবাই। সেটিংগুলিকে চমৎকার করবার জন্যে সেটিং-মাষ্টার শঙ্কর ঘোরাজি বিশেষ পরিশ্রম করছেন। সেটিং প্রভৃতি আনুষঙ্গিক শিল্প-ব্যবস্থায় শঙ্কর ঘোরাজির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বড় কম নয়—ইতিপূর্ব্বে তিনি অন্ততঃ যাট্‌খানি ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে কৈলাসে শিবের যে বাসস্থান নির্ম্মিত হচ্ছে তা নাকি দর্শকদের কাছে এক অভিনব ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মায়ালোক বহন ক'রে আনবে। পরিচালক জ্যোতিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ছবিখানিকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার জন্য দিন-রাত্রির ভেদ রাখছেন না।

এঁদের উর্দ্দু টকি "নাগান্" বোম্বাই অঞ্চলে অসামান্য সাফল্য অর্জ্জন করেছে। ছবিখানি শীঘ্রই কলকাতায় আসবে।

চারু রায়ের পরিচালনায় তোলা হিন্দী "রাজনটী"র কাজও প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

*

কালী ফিল্মসের—উর্দ্দু ছবি "আমীনা" মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে। শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়ের "তরুণীর" শূটিং আরম্ভ হ'য়ে গেছে। 'অন্নপূর্ণার মন্দিরের" ভূমিকা নির্ব্বাচন চলছে।

*

নিউ থিয়েটার্সের—তরফে শ্রীযুক্ত প্রেমাঙ্কুর আতর্থী আর একখানি উর্দ্দু ছবি হাতে নিয়েছেন। ছবির নাম "লালা রুখ্"। আশা করি, "লালা রুখ্" "ইহুদি কি লড়কির" সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখবে।

*

রূপবাণীতে—"ঋণমুক্তি" বা "নরমেধ যজ্ঞ" সমভাবে দর্শক আকর্ষণ ক'রে চলেছে। বাঙালী পুরাঙ্গনাদের কাছে "ঋণমুক্তি" সুখ্যাতি অর্জ্জন করেছে বিশেষ ভাবে।

*

চিত্রায়—"রূপলেখা" কাল থেকে চতুর্থ সপ্তাহে পড়্‌বে। ছবিখানি জমেছে।

*

"চাঁদ-সদাগর" ক্রাউনে এখনো তাঁর বিজয়-ভেরী বাজাচ্ছেন ! বিজ্ঞাপনে প্রকাশ ভেরীর আওয়াজ নাকি আগের চেয়ে শ্রুতিমধুর হয়েছে।

——

ডাকঘর

"রূপলেখা"

রঞ্জন রুদ্র মহাশয়ের সমালোচনা প'ড়ে, আজ চিত্রায় রূপলেখা দেখে এলাম। ছবিখানি দেখে আনন্দ পেয়েছি প্রচুর। তাই এ-সম্বন্ধে কিছু বলবার আছে। পত্রখানি আপনার পত্রিকায় স্থান পেলে বাধিত হব।

ছবিখানির আখ্যান-ভাগের কথাই প্রথমে বলি :—

রূপলেখার গল্পটী পুরাণ কাহিনীর মত নিষ্প্রাণ নয়। তার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। এর love elementটুকু অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সংসার-অনভিজ্ঞ এক রাখাল বালক ও বন বিহারিণী এক সরলা কিশোরীর সামান্য জীবনেতিহাসকে ঘিরে যে মধুর প্রেম-কাহিনীটীকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দর্শকদের মনে একটী স্থায়ী রেখাপাত করেছে। ছবিখানির বৈশিষ্ট্য দেখে খুসী হলাম——গল্পের কোথাও cheap রসিকতা introduce করে তাকে চিত্তাকর্ষক বা লোভনীয় করবার চেষ্টা হয়নি। এর দ্বারা চিত্র-নাট্যকারের কৃতিত্ব ও সহজ নিপুণতার পরিচয় পেয়েছি।

রূপলেখার অন্যান্য শ্রেষ্ঠত্বের অনুপাতে গল্পের dialogue তেমন ভাল লাগল না। সাহিত্য-রস ছিল তার মধ্যে অল্পই। ছবিখানির dialogue যেন ঢিমে তালে এগিয়ে চলেছে। কোথাও তেমন intensity বা pointedness লক্ষ্য করলাম না।

ছবিখানি পরিচালনার জন্য পরিচালক মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁর সুনিপুণ অভিজ্ঞতা ও রসবোধ দ্বারা তিনি ছবিখানিকে আগাগোড়া সুদৃশ্য করে তুলেছেন। তাঁর পরিচালনার গুণে ছবিখানি কোথাও dull বা boring বোধ হয়নি।

ফটোগ্রাফী ও রেকর্ডিং ভালই হয়েছে। ঐ দিক থেকে ছবিখানিকে এমেরিকান যে কোন প্রথম শ্রেণীর ছবির পাশে স্থান দেওয়া যেতে পারে। বাঙ্গলা ছবির ফটোগ্রাফী যে এত অল্পদিনে এতদূর উন্নত হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

অভিনেতাদের কথা বল্‌তে গেলে প্রথমে শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম উল্লেখ করতে হয়। মহারাজ অশোকের ভূমিকায় একাধারে তিনি মহারাজ-সুলভ dignity ও প্রচ্ছন্ন বেদনার যে অপরূপ ভাব প্রকাশ করেছেন, তা বোধ করি আর কোন বাঙ্গালী অভিনেতার দ্বারা সম্ভব হ'ত বলে মনে হয় না। অহীন্দ্রবাবু ছায়া-ছবিতে যত চরিত্র অভিনয় করেছেন, তন্মধ্যে অশোক যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তা আমি অসঙ্কোচে বলতে পারি। তাঁর অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে, জার্ম্মাণ অভিনেতা এমিল জেনিংসের অভিনয়ের কথা বার বার মনে পড়ছিল। আজ থেকে তাঁকে বাংলার এমিল জেনিংস বলতে আমার কুণ্ঠা নেই।

মহেশ্বর অভিনয়ে মনোরঞ্জনবাবু তাঁর পূর্ব্বেকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাঁর অভিনয়ে ন্যায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ মহেশ্বরের চরিত্র সুস্পষ্ট ফুটেছে।

অরূপের ভূমিকায় প্রমথেশ বাবুর অভিনয় ভাল হলেও—তাঁকে আমরা উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা কর্‌তে পার্‌লাম না। চিত্রনাট্যকার-রূপে তিনি অরূপ চরিত্রটীকে যত মধুর ক'রে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর অভিনয়ে ততখানি মাধুর্য্য বোধ করি ফুটে ওঠেনি।

ছায়াচিত্রাভিনেত্রীদের মধ্যে শ্রীমতী উমা যে অদ্বিতীয়া তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর অন্যান্য চরিত্র অভিনয়ের মতই তিনি মনের নিগূঢ় দরদ দিয়ে সুলেখা চরিত্রের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।...এক কথায় বল্‌তে গেলে, সমস্ত সুলেখা চরিত্রের মধ্যে একটী অখণ্ড মঞ্জুশ্রী ফুটে উঠেছে। শ্রীমতী উমার অভিনয় যেমন উঁচু সুরে বাঁধা, তাঁর গানগুলি কিন্তু তদনুরূপ ভাল হয়নি। তাঁর গানগুলি যদি একটু একঘেয়ে না হ'ত তাহ'লে চরিত্রটী আরও অখণ্ড সাফল্যমণ্ডিত হ'ত, এই আমার বিশ্বাস।

যাই হোক্, ছবিখানিতে দু-একটী সামান্য ত্রুটী দেখা গেলেও, মোটের ওপর তা হয়েছে চমৎকার।

সত্য কথা বল্‌তে কি, বাঙ্গালা দেশে এ পর্য্যন্ত যতগুলি বাঙ্গালা ছবি পর্দ্দার উপর আত্মপ্রকাশ করছে, তন্মধ্যে রূপলেখা যে সকল বিচার্য্য-দিক থেকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এ বিষয়ে বোধ করি মতদ্বৈধ হবে না। ইতিপূর্ব্বে কোন বাঙ্গালা ছবিই আমাদের এতখানি আনন্দ পরিবেশন করতে পারেনি। চিত্রার কর্ত্তৃপক্ষ এই ছবিখানি এমনি মনোরম ও হৃদয়গ্রাহীরূপে produce করে রসদৃষ্টির যে পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তাঁরা সকলেরই ধন্যবাদ ও প্রশংসা অর্জ্জন করবেন, সন্দেহ নেই।

কলিকাতা }
১৫ বৈশাখ ১৩৪১ }　　　　শ্রীমতী নির্ঝরিণী বন্দ্যোপাধ্যায়

কুজ্ ঝটিকা

শ্রীকানাই লাল পাল

কথা-নাট্য

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বিজয়

সুমিত্রার পিতার সঙ্গে কোন দিন আমার প্রচুর পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি, সুতরাং তাঁর বিচারবুদ্ধি ও স্বভাব নিয়ে আলোচনা করব না। তিনি আজ স্বর্গে, তাঁর বিরুদ্ধে আমার কোন অনুযোগও নেই। আজকের দিনের আমার সমস্ত দুষ্কৃতির কথা সুমিত্রাকে জানাব,···সে-ই হবে আমার একমাত্র ও চূড়ান্ত বিচারক। সে আমায় বিশ্বাস করে উত্তম·· নতুবা আইনের দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করতে আমি ইতস্ততঃ করব না।

মালবিকা

চুপ! উপরে কার যেন পদশব্দ শুনতে পেলাম...

[উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিল]

হয়তো সুমিত্রা উঠেছে। ওই সে নেমে আসছে···হয়তো এখানেই আসবে। সাবধান বিজয়...আশা করি তোমার প্রতিজ্ঞার কথা তুমি বিস্মৃত হবেনা।

[ধীরে ধীরে সুমিত্রা প্রবেশ করিল। তাহার আয়ত উজ্জ্বল চক্ষু দুটী নিদ্রাহীনতার চাপে নিষ্প্রভ। সুদীর্ঘ কেশরাশি যত্নের অভাবে অসন্নিবিষ্ট। তাহার সর্ব্ব অবয়বের মধ্যে একটী মৃদু কম্পন, একটী শিথিলতা প্রকাশ পাইতেছিল। বিজয়কে দেখিয়াই আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে ছুটিয়া গিয়া একেবারে তাহার হাত দুটী ধরিয়া ফেলিল]

সুমিত্রা

বিজয়!···[মালবিকার মুখের দিকে চাহিয়া অনুযোগের সুরে] আমায় ডাকনি কেন দিদি?

মালবিকা

তুমি যে ঘুমিয়ে ছিলে বোন....ঘুমন্ত তোমায় ডাকা যে ডাক্তারের নিষেধ।

সুমিত্রা

[কিঞ্চিৎ হাসিয়া] দিদি! তোমরা কী বোকা বলত? ভালোবাসা যারা পায়নি তারা এমনিই বটে। বিজয় এসেছে ব'লে ডাকলে আমার জীবনে এতটুকু ক্ষতি হত, একথা ভাবতে তোমায় কে শেখালো বলত?

[বিজয়ের দিকে ফিরিয়া গদগদ কণ্ঠে] আমায় ডাকনি কেন? তুমিও কি এদেরই দলের?

বিজয়

না। এতক্ষণ তোমার কথাই জিজ্ঞাসা করছিলাম সুমিত্রা।

সুমিত্রা

কতদিন···কতদিন পরে তোমায় আবার কাছে পেয়েছি।··কিন্তু স্বপ্নেও কে কল্পনা করেছিলো যে আমার এত বড় দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়ে তোমায় ফিরে পেতে হবে! জান বিজয়, আমার জীবনের উপর দিয়ে একটা বিরাট ঝড় বয়ে গেছে। আজ আমি পিতৃহীন...ওরা আমার হৃদয়টাকে নিঃশেষে রিক্ত ক'রে চূর্ণ করে দিয়েছে।······ও মাগো!······

[কাঁদিতে লাগিল]

বিজয়

[অতিশয় উদ্বিগ্ন কণ্ঠে] সুমিত্রা, সুমিত্রা··শান্ত হও, শান্ত হও। উত্তেজিত হয়োনা।

সুমিত্রা

না। আজ আমি উত্তেজিত হব না। আজ ন্যায়ের দাঁড়ি পাল্লায়, আমার দেনা পাওনার পরিমাণ যাচাই করছিলাম।···দেখলাম বিধাতার হাত থেকে এতটুকু পাওনা বাড়তি ফাঁকি দিয়ে আদায় করবার যো নেই।···কড়ায় গণ্ডায় সব তাকে চুকিয়ে দিতে হয়। কিন্তু যাক সে সব কথা—এতদিন কোথা ছিলে বিজয়?

বিজয়

তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাতো সম্ভব ছিল না সুমিত্রা!

সুমিত্রা

কে তোমায় বাধা দিল···কেন, কাঁদছিলাম বলে? এই দেখ আর আমি কাঁদছি না···কাঁদবার আর আমার অবসর কই? আমার সমস্ত কান্না আমার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে শেষ করে দিয়েছি। আজ শুধু আমি চাই, যারা আমার পিতাকে পশুর মত হত্যা করেছে তাদের শাস্তি দিতে··· এই আমার পণ। বিজয়, বিজয়, আমি তোমার সাহায্য চাই···ওগো, তুমি আমার সহায় হও।

[উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল]

বিজয়

তুমি উত্তেজিত হয়েছ···এখুনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে।

সুমিত্রা

উত্তেজিত আমি হইনি।···এমনি করেই আমি আমার শোকের সান্ত্বনা পাই। যারা আমার পিতাকে বর্ব্বরের মত গুপ্তহত্যা করেছে তাদের জন্য আমার অন্তরের অনন্ত ঘৃণা তোলা রইল। ক্ষমা করবনা···কোনমতেই তাদের ক্ষমা করবনা।

বিজয়

[বিবর্ণমুখে] শান্ত হও সুমিত্রা, শান্ত হও। হত্যাকারীর আজও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। এওতো সম্ভব, হয়তো কেউ অজ্ঞাতে অকল্পিত ভাবে হঠাৎ এই হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়েছে—তাদেরও কি ক্ষমা তুমি করবেনা সুমিত্রা···? (অধীর আগ্রহে তাহার মুখের দিকে চাহিল)

সুমিত্রা

না, ক্ষমা করবনা···মালবিকার মুখে শুনছি তুমি এর অনুসন্ধান করছ।

বিজয়

এ-সম্বন্ধে আমি আজও কোন সিদ্ধান্তে পৌছইনি সুমিত্রা! কিন্তু—

সুমিত্রা

তোমায় এমনি করে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবেনা!···ওগো বন্ধু, আমার এই বিপদ-যজ্ঞের আহুতি তোমাকেই দিতে হবে। বল, থামলে কেন, বলে যাও···মালবিকার সামনে সমস্ত কথা বলতে তোমার কিছু আপত্তি আছে? মালবিকার সম্মুখে কোন কথা বলতে সঙ্কোচ করোনা বিজয়!···চেয়ে দেখ ওর শান্ত স্থির মুখের দিকে, অবিশ্বাসের কোন চিহ্নই ওখানে বর্ত্তমান নেই। তবুও নীরব? ও বুঝেছি··

[মালবিকার মুখের দিকে চাহিল, সে নিরবে নতদৃষ্টি হইয়া বামের দ্বার দিয়া বাগানের পথে বাহির হইয়া গেল। সুমিত্রা বিজয়ের হাত ধরিয়া পাশের কৌচের উপর বসাইল ও আপনি তাহার পার্শ্বের খানিতে বসিয়া পড়িল। উভয়ে নিরবে অনেকক্ষণ উভয়ের দিকে চাহিয়া রহিল। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পরে বিজয় সুমিত্রার দুই হাত আপনার করতলের মধ্যে লইয়া তাহাকে আরও কাছে আকর্ষণ করিয়া বলিতে লাগিল]

(ক্রমশঃ)

চিত্রা
CHITRA

কলিকাতা, ১৪০ নং কর্পোরেশন ষ্ট্রীটস্থ নাচঘর কার্য্যালয় হইতে শ্রীধীরেন্দ্র লাল ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
কলিকাতা, ২৯ নং গ্রে ষ্ট্রীটস্থ ইউনাইটেড প্রেসে প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

নাচঘর

প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পয়সা] Regd. No. 1304. [বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ টাকা

১০ম বর্ষ
১৫শ সংখ্যা

সম্পাদক—
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

২৮শে বৈশাখ
১৩৪১

কলালাপ

বাংলা চলচ্চিত্র তো আজকাল প্রায়ই দেখতে হচ্ছে। সখের খাতিরে নয়, কাজের ঠেলায়। এ-কথা বলবার কারণ, কেবল সখের জন্যে হ'লে, আজ আমরা দেশী চিত্রালয়গুলির ধার মাড়াতুম কিনা সন্দেহ! ললিত কলার দিক দিয়ে ছবির ভিতরে যত-রকম দোষ থাকা সম্ভব, এদেশের শ্রেষ্ঠতম পরিচালকের তোলা ছবিতেও তার অভাব নেই। দেশী ছবি দেখে সমালোচকরা যখন-তখন মত-প্রকাশ করেন বটে,—'অমুক ছবিখানি দেখলে ঠিক বিলাতী ছবি ব'লে ভ্রম হয়,' কিন্তু এ-সব মিথ্যা অত্যুক্তির জন্ম যে দেশপ্রেমের মধ্যে, সেটা সমালোচকরাও জানেন, পাঠকরাও জানেন। বাংলা দেশে আজ পর্য্যন্ত এমন ছবি একখানাও হয় নি, য়ুরোপ-আমেরিকায় যা তৃতীয় শ্রেণীর ছবি ব'লেও আদর পেতে পারে। এমন অবস্থায়, ছবিকে যাঁরা আর্ট ব'লে মানেন তাঁদের পক্ষে দেশী ছবি দেখবার সখ না হওয়াই উচিত।

*

কথাপ্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ল। কিছুকাল আগে একখানি সাময়িক পত্রে (বোধ হয় 'চিত্রপঞ্জী'তে) দেখেছিলুম জনৈক সাহিত্যিক লিখে জানিয়েছেন যে, চলচ্চিত্র তাঁর চোখের বালি, কারণ তা আর্ট নয়! খুব সম্ভব। যেমন-ক'রেই-হোক একটা নতুন কথা বলবার আগ্রহেই এমন অসম্ভব উক্তি তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়েছে, নইলে আধুনিক ছবি দেখবার পরেও পাগল ছাড়া আর কারুর মুখ দিয়েই এ-রকম প্রলাপ বেরুতে পারে না। জানি, চিত্রজগতের নির্ব্বাক যুগে ছবিকে একটা নিম্নশ্রেণীর আর্ট বা আধা-আর্ট বলা চলত। কিন্তু ছবি যখন থেকে কথা কইতে শিখেছে তখন থেকেই সে আর্টের উচ্চ-শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ছবির নট-নটী উঁচুদরের কলাবিদ নন বটে, কিন্তু পরিচালক ও সম্পাদককে কলাবিদ না বললে চলবেই না। এবং তাদের বিশেষ চেষ্টার ফলে যে-জিনিষটি আমরা পাই তাও হচ্ছে একটা মস্ত-বড় আর্ট, কারণ তা রসসৃষ্টি ও আনন্দদান করতে পারে—আর আর্টের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে রসসৃষ্টি ও আনন্দদান করতে পারা।

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত নর্ত্তক
আং পে

*

কিন্তু বাংলা ছবি যে এখনো উচ্চশ্রেণীতে উঠতে পারে নি, এ-সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকা উচিত নয়। ক্রমোন্নতি প্রাকৃতিক নিয়ম বটে, কিন্তু একহিসাবে বাংলা ছবি জন্মের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রায় এক ভাবেই আছে। অবশ্য বাংলা ছবির আলোকচিত্র আগেকার চেয়ে এখন ঢের ভালো হয়েছে, কিন্তু তার কারণ হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতির মহিমা। এবং ছবিতে এখন কথা ও আনুষঙ্গিক সঙ্গীত প্রভৃতিও পাই, কিন্তু এ-সবও কালধর্ম্মের প্রভাব—এর জন্যে বাঙালীর মস্তিষ্ককে বাহবা দেবার সুযোগ নেই। কারণ এ-সব হচ্ছে বাইরের উন্নতি এবং এ-সব বিভাগেও বোম্বাই প্রদেশ বাংলাকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেছে—মস্তিষ্কে যে দেশের লোক বাঙালীর চেয়ে নিকৃষ্ট। বাংলা ছবিকে যে-পথে চালনা করা হয়েছে সে-পথে থাকলে কোনদিন তার উন্নতি হবে

ব'লেও বিশ্বাস করি না। ভুল পথ কখনো কারুকে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যায় নি।

*

চিত্রজগতের অকৃতকার্য্যতার জন্যে বাঙালীর মস্তিষ্কের হীনতা প্রমাণিত হয় না। আর্টের সকল বিভাগেই আধুনিক বাঙালীর মস্তিষ্ক তার বিশিষ্ট পরিচয় দিয়েছে। বঙ্কিম, মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথের মতন সাহিত্যিক, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলালের মতন চিত্রকর, অঘোর চক্রবর্ত্তী, রাধিকা গোঁসাই ও কৃষ্ণচন্দ্রের মতন গায়ক, গিরিশ, অর্দ্ধেন্দু ও শিশিরকুমারের মতন অভিনেতা এবং উদয়শঙ্করের মতন নর্ত্তক পৃথিবীর যে-কোন দেশের গৌরব বৃদ্ধি করতে পারে। এঁরা যে-সব ললিত কলার সেবক, চলচ্চিত্র তার চেয়ে বড় শিল্প নয়। সুতরাং চলচ্চিত্রেও বাঙালী যে অনায়াসেই প্রতিভা দেখাতে পারে, এ-বিষয়ে সন্দেহের কারণ নেই।

*

কিন্তু বাংলার চিত্রজগৎ আজ যাঁরা দখল ক'রে আছেন, তাঁদের অনেকেরই যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কারণ আছে যথেষ্ট। ঠিক যে-লোকগুলিকে দরকার, আমাদের চিত্রজগতের কর্ম্মীদের মধ্যে তাঁদের দেখতে পাই না। যাঁরা আজ কোমর বেঁধে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের মধ্যে চারআনা খাঁটি, বাকি সব মেকি। যাঁরা এ-কথার প্রতিবাদ করতে উদ্যত হবেন, বাংলা ছবিগুলিই তাঁদের প্রতিবাদের প্রতিবাদ করতে পারবে। বাংলা ছবির আসরে হোম্‌রা-চোম্‌রা সেজে যাঁরা আজ উপদ্রব করছেন, তাঁদের অধিকাংশই হচ্ছেন শিক্ষানবিশ মাত্র। চলচ্চিত্র-সম্পর্কীয় দু-চারখানা বই এবং বাঁধাবুলি মুখস্থ ক'রে দুনিয়াকে তাঁরা নস্যাৎ ক'রে দিতে চান, অনেকের আবার সেটুকু বিদ্যাও নেই—তাঁরা চলছেন ধাপ্পাবাজির জোরে।

*

বাংলা চলচ্চিত্র অচল হবার সব চেয়ে-বড় কারণ পরিচালনা-বিভ্রাট। পূর্ণাঙ্গ পরিচালক বাংলা দেশে একজনও নেই। আগেই বলেছি, চলচ্চিত্রের আসল কলাবিদ হচ্ছেন পরিচালক। কিন্তু বাংলা ছবির মুল্লুকে উকি মারলে মনে হবে, সেখানে পরিচালক হবার যোগ্যতা আছে সকলেরই। বিশেষ, একবার কি দুবার ছবিতে অভিনয় করলে তো কথাই নেই, পরিচালকের পদে তাঁর দাবি সর্ব্বাগ্রে। শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ধীরাজ ভট্টাচার্য্য আজও যে কেন পরিচালক-মূর্ত্তি ধারণ করেন নি, মাঝে মাঝে তাই ভেবে আশ্চর্য্য হই। কিছুদিন আগে এমন একজন কবিকে ডেকে এনে পরিচালকের পদে বসানো হয়েছিল, যিনি জীবনে কোনদিন চলচ্চিত্র নিয়ে মাথা ঘামান নি! সংপ্রতি এই শ্রেণীর একজন নাট্যকারও নাকি পরিচালক হবার জন্যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন এবং শুনছি কলকাতার কোন চিত্র-সম্প্রদায় নাকি অবিলম্বেই তাঁর বাসনা পূর্ণ করবেন! "নিউ-থিয়েটার্সে"র মতন বাংলার একটি গৌরবজনক চিত্র-প্রতিষ্ঠানও পরিচালক-নির্ব্বাচনে উচিতমত দৃষ্টি দেন না। একটি অতি-তরুণ ও চিত্রজগৎ সম্বন্ধে প্রায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তির স্কন্ধে সহসা তাঁরা পরিচালনার গুরুভার নিক্ষেপ করেছেন। হয়তো তাঁদের দলে এমন-সব অভিজ্ঞ ব্যক্তির অভাব নেই, অন্তরাল থেকে সাহায্য ক'রে যাঁরা এই নবীন যুবকটিকে আপাততঃ যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার মত নির্দ্দিষ্ট পথে আগ বাড়িয়ে দিতে পারবেন, কিন্তু এই শিশুটি যখন মহারথ সেজে অন্য কোন সম্প্রদায়ে গিয়ে জনসাধারণের উপরে অত্যাচার শুরু করবেন, তখন? তখন কে দায়ী হবে? ছেলেটি এই বয়সে গান লিখতে, গান গাইতে, গানে সুর দিতে, নাটক লিখতে এবং অভিনয় করতেও শিখেছেন, তার উপরে হ'লেন এখন চিত্র-পরিচালক! আমরা অবাক্ হয়ে ভাবি, এমন কাঁচা বয়সে ইনি এত বিদ্যা সঞ্চয় করলেন কোন্ কুস্ মন্ত্রের গুণে? কিন্তু আমাদের ও-পাড়ার মোড়ল ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলেন—উঁহু, দাড়ি কামাতে শিখেই কেউ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে না, একসঙ্গে এই বয়সে এত'দকে লাফালাফি করবার মানেই হচ্ছে, ইনি নিজেই জানেন না কোন্ জমিতে ও'র দখল আছে!

*

কলকাতায় এখন এমন একাধিক চিত্রপ্রতিষ্ঠানের অভাব নেই, যেখানে আধুনিক যুগের উপযোগী প্রথম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম ও বিশেষজ্ঞ যন্ত্রশিল্পী আছে। ওখানকার কর্ত্তাব্যক্তিরা ছবির জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতেও একটুও কাতর নন। তবু ছবি যখন বাজারে বেরোয় তখন তা রসিকের পাতে দেবার যোগ্য হয় না কেন? এর মস্ত একটি কারণের কথা বলতে পারি। যত ভালো আলোকচিত্রই হোক্, যত উন্নত যন্ত্রপাতিই হোক্ আর যত বেশী টাকা খরচ, নট-নটী সম্মিলন, জাঁকজমক ও হৈ-চৈ করাই হোক্, ছবির ভিতরে গল্পই হচ্ছে প্রধান। চিত্র-লিখিত গল্প পড়বার জন্যেই লোকে চিত্রালয়ে যায়। ভালো আলোকচিত্র, ভালো অভিনয় বা ভালো আনুষঙ্গিক সঙ্গীত, এ-সব ছবির গল্পের অলঙ্কার ছাড়া আর কিছুই নয়। এগুলি খুবই ভালো জিনিষ, কিন্তু ছবির গল্প যদি হয় ছাই-ভস্মের সামিল, তাহ'লে এগুলিকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করলে ভস্মে ঘৃতাহুতিই দেওয়া হবে। আবার ভালো গল্পও যদি ভালো ক'রে বলা না হয়, তবে সে-ক্ষেত্রেও ও-সব অলঙ্কার হবে ব্যর্থ, কারণ গল্প হচ্ছে ছবির দেহের মত, দেহকে ছেড়ে কেউ গহনাকে দেখে না,—যারা দেখে তাদের রুচি বিকৃত। ঠিকমত গল্প বলতে পারেন, বাঙালী পরিচালকদের ভিতরে এখনো এমন লোকের অভাব বোধ করছি। তবে ওরই মধ্যে কতকটা চলনসই গল্প বলবার কায়দা দেখেছি "নিউ-থিয়েটার্সে"র কোন কোন ছবিতে। শ্রীযুক্ত কালিপ্রসাদ ঘোষও মন্দ গল্প বলেন না, তাই নানা বিষয়ে দীন হয়েও তাঁর কোন ছবিই ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু কোন বাংলা ছবিতেই অদ্যাবধি নির্দ্দোষভাবে গল্প বলা হয় নি। হ'লে, এখানকার জনপ্রিয় ছবিগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হ'তে পারত।

*

কোন গল্প হাতে পেলে শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আগে ভাবা উচিত, কেমন ক'রে বললে সে গল্প শুনতে ভালো হয়। কিন্তু অনেক বাঙালী পরিচালকের পরিচালনা-পদ্ধতি হচ্ছে ভিন্ন রকম। তাঁদের মগজের ভিতরে যে-সব আড়ম্বরের ব্যাপার গজ্ গজ্ করে, যে কোন গল্প হাতে পেলেই তার মধ্যে তাঁরা সেই-সব ব্যাপার ঢুকিয়ে দেন প্রাণপণে। কোথায় প'ড়ে থাকে গল্প ও ঘটনার ধারা, মাঝখান থেকে গজিয়ে ওঠে যত-সব ধুমধাড়াক্কার হৈ-চৈর কাণ্ড এবং দর্শক বেচারীদের হয় প্রাণান্ত-পরিচ্ছেদ! সংপ্রতি কলকাতার কোন চিত্রাগারে ঠিক এই শ্রেণীরই একখানি ছবি অনেকদিন ধ'রে চলছে। কিংবা ছবিখানিকে অনেকদিন ধ'রে চালানো হচ্ছে। অনেক বাংলা ছবির গল্পাংশ যেমন রাবিস, তেমনি অনেক ভালো গল্পও চিত্র পরিচালকদের হাতে প'ড়ে মাঠে মারা গেছে—সঙ্গে সঙ্গে ছবিখানিকেও ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসেরই গল্পাংশ চমৎকার। কিন্তু কোন ছবিই তার মর্য্যাদা রাখতে পারেনি। তবু যে ছবিগুলি চলেছে, তা কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের নাম-মহিমায়। আমাদের বিশ্বাস, এই কথক-'চক্রের যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের গল্পগুলিকে যদি কেউ আবার—ভালো ক'রে না হোক্, চলনসৈ রূপেও—বলতে পারেন, তবে তাঁর কপাল ফিরে যাবে। একে বঙ্কিমের নামের

মালবিকা

হাসির কথা নয় স্থমিত্রা,···আমি আজ যা বলবো তা অতি ভয়ঙ্কর,··· ছঃখেরও।

স্থমিত্রা

উত্তম! বলে যাও। আমি কথা দিচ্ছি মরে গেলেও হাসবো না।

[কিছুক্ষণ থামিয়া করুণ স্থরে।]

তুমিতো জান মালবিকা,···এম্নি করেই আজ আমি শুষ্ক হাসির মাঝেই আমার অপরিমেয় ছঃখের সান্ত্বনার সন্ধান করি।

[বলিতে বলিতে তাহার স্বর গাঢ় হইয়া আসিল।]

মালবিকা

জানি। তাই বলতে সাহস হয় না। আমি আজ যা বলবো তা কেউ জানে না।...হয়তো বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়,···একথা তোমার কাছে প্রকাশ করতাম না। জানি, এর ফুৎকারে তোমার মনের আনন্দ-দীপগুলো একে একে নিভে যাবে। কিন্তু,—

স্থমিত্রা

[উদ্বিগ্ন স্বরে] আবার!

মালবিকা

[দৃঢ়স্বরে] আমি জানি কে কাকাবাবুকে হত্যা করেছে।

স্থমিত্রা

[উঠিয়া দাঁড়াইল] তুমি, তুমি জান মালবিকা? কে, কে আমার পিতাকে হত্যা করেছে?

[আগ্রহে তাহার চক্ষুচুটী উজ্জল হইয়া উঠিল]

মালবিকা

[রুদ্ধ নিঃশ্বাসে] বিজয়···

[বিজয়ের নাম শুনিয়াই স্থমিত্রা শিহরিয়া সভয়ে ছই পা পিছাইয়া গেল। তাহার সমস্ত উৎসাহ চকিতে ম্লান হইয়া গেল। সে কথা বলিল না।···বিবর্ণ মুখে হতাশ ভাবে মালবিকার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। উভয়েই নিরব। মালবিকার চক্ষু ছইটী হইতেও তখন কী এক অস্বাভাবিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। স্থমিত্রা কয়েক মূহুর্ত্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কি জানি কি ভাবিয়া খল খল করিয়া হাসিয়া উঠিল]

স্থমিত্রা

বিজয়! হাঃ হাঃ হাঃ! মালবিকা!

মালবিকা

[বিবর্ণ মুখে] আমার কথা তোমার হয়তো বিশ্বাস হবে না, কিন্তু সে যদি স্বীকার করে?

স্থমিত্রা

[বিস্মিত ভাবে] কে স্বীকার কর্ব্বে! কী স্বীকার কর্ব্বে!

মালবিকা

[দৃঢ় স্বরে] তোমার পিতাকে সে হত্যা ক'রেছে।

স্থমিত্রা

কে?···বিজয়?···

[কিছুক্ষণ বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীটিকে দংশন করিতে করিতে বিহ্বল দৃষ্টিতে কী যেন ভাবিতে লাগিল]

হাঁ আমি বিশ্বাস কর্ব্বো।···কিন্তু এতো আমার কাছে প্রহেলিকার মতই মনে হ'চ্ছে। এ কী রহস্য মালবিকা?

[চক্ষু ছটী ছল ছল করিয়া উঠিল]